হাজেরীতে রবীন্দ্রনাথ

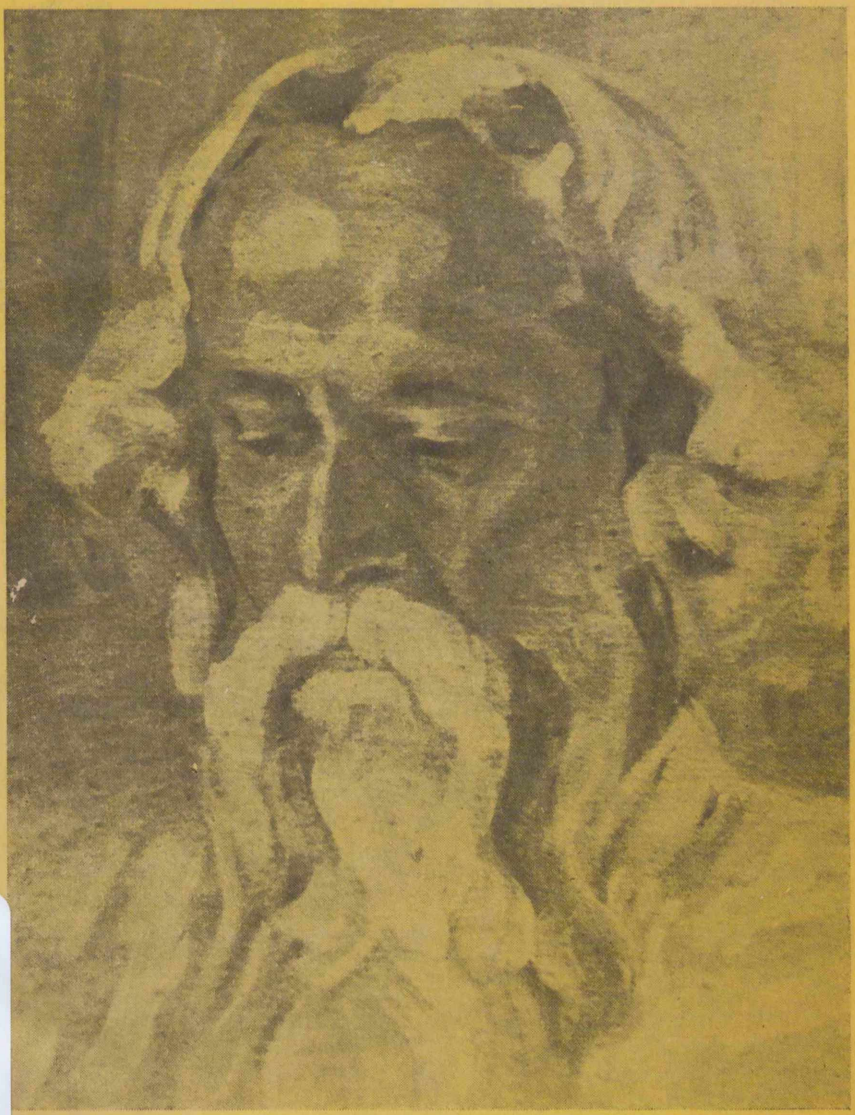

অধ্যাপক সুনীল কর

1287439

হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক সুনীল কর

নবযুগ পাবলিশার্স
কলিকাতা

MTA
KIK
0 00005 77130 1

মূল রচনা : জুলা উইটিলা
অনুবাদ : বিশ্বজিৎ রায়
সম্পাদনা : সুনীল কর
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জোসেফ সাবো, ডাইরেক্টর,
হাঙ্গেরীয় সংস্কৃতি ও তথ্য কেন্দ্র
নিউ দিল্লী

Keleti Gyűjtemény
783.770
Wojtilla, Gyula :
Haṅgerite Rabīndranātha

202117863

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮৪

© বাংলা অনুবাদ : নবযুগ পাবলিশার্স

প্রচ্ছদ : এলিজাবেথ ব্রুনার

MTA KÖNYVTÁR ÉS
INFORMÁCIÓS KÖZPONT

মূল্য : ২৫·০০ টাকা

প্রকাশক : নবযুগ পাবলিশার্স, পোস্ট বক্স নং ১০২৩২
কলিকাতা-৭০০০১৯

মুদ্রাকর : রাজধানী প্রিন্টিং, ১১৭/১, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-৯

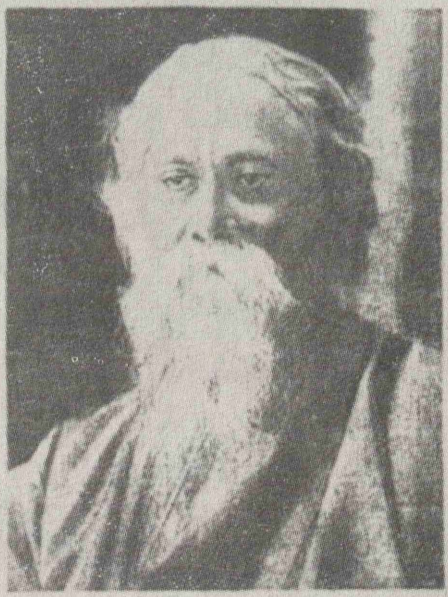

বুদাপেস্তে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সভার জন্য আমন্ত্রণ লিপি।

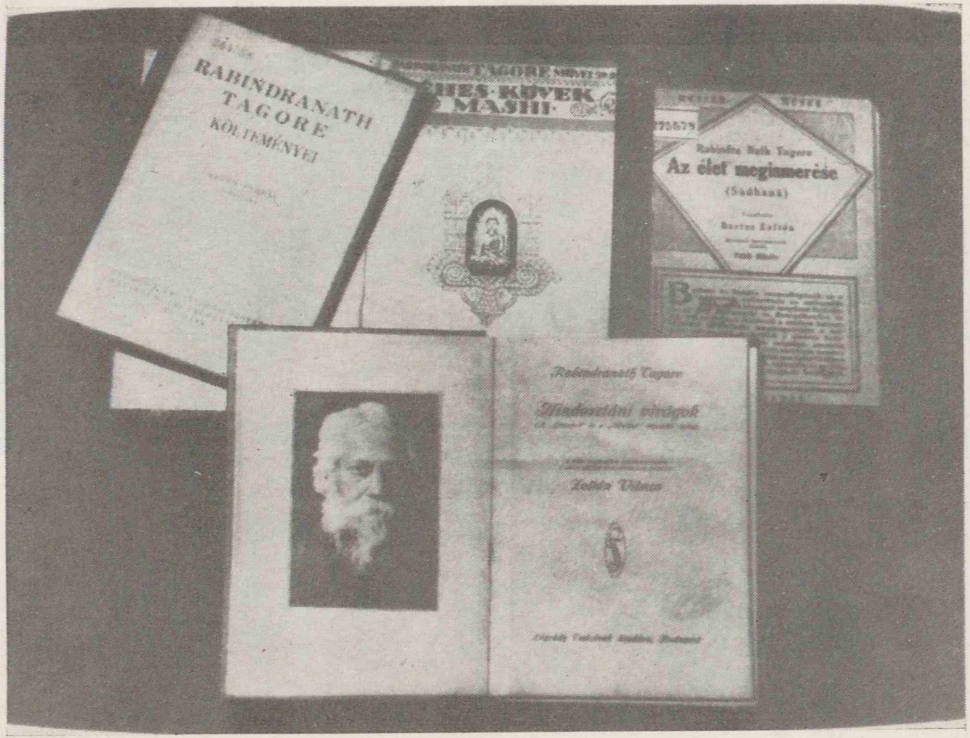

হাঙ্গেরীয় ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থ।

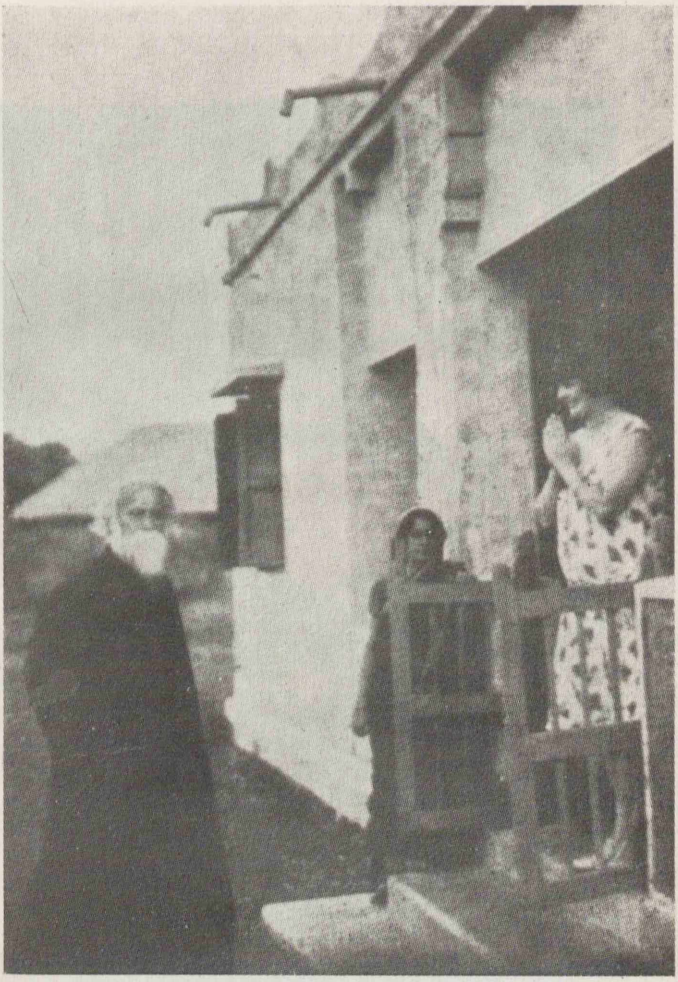

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীমতী রোজমা হাজনোস্‌জি।
সঙ্গে প্রতিমা দেবী।

বালাতোন ফুয়র্দের হাসপাতালের ডাইনিং হল-এ রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে রাণী মহলানবীশ।

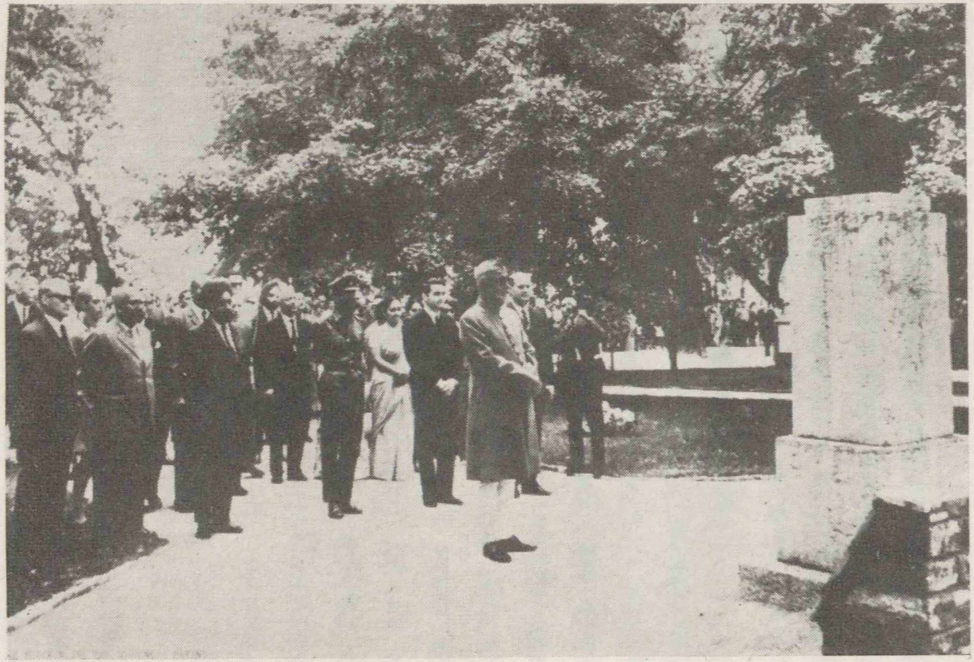

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন বালাতোন ফুয়র্দে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির সামনে দণ্ডায়মান।

ভূমিকা

আজও হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি যথেষ্ট উজ্জ্বল। তার পরিবর্তন ঘটছে বটে। কিন্তু কালের ত্রুটিহীন বিচারের রেখায় ধরে সে মূর্তিটি চিনতে দেরী হয় না।

হাঙ্গেরীর পটভূমিকায় বিরচিত আমার এই ছোট লেখায় আমি বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যের প্রভাব কেমন হয়েছে—সেই সম্পর্কিত যা কাজ হয়েছে তাতে কিছু সংযোজন করতে চেয়েছি। আমার ধারণা, এইসব কাজ মানুষ, কবি এবং ভাবুক রবীন্দ্রনাথকে জানার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

বড় বড় রবীন্দ্র-জীবন-চরিতাদিতে রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরী ভ্রমণের কথা বেশী নেই। এর বোধহয় অনেক কারণ আছে। যথা, তাঁর জীবন কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনার অভাব। বস্তুত, তাঁর সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী বা তাঁর ওপর দীর্ঘ সমালোচনা গ্রন্থের স্বল্পতাও যথেষ্ট। রথীন্দ্রনাথের ১৯২৬-এর ডাইরিতে হাঙ্গেরীর উল্লেখ নেই, যদিও ছোটখাট সফরের কথা তাতে আছে। আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হলো, তাঁর হাঙ্গেরীর কার্যসূচীর বিষয়ে তথ্যাভাব। সে সব তথ্য লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের অসম্পাদিত গ্রন্থে, পত্রাদিতে, সেই যিনি রবীন্দ্রনাথের একান্তসচিব ছিলেন তাঁর অপ্রকাশিত ডাইরিতে এবং আরো বৃহত্তরভাবে তৎকালীন হাঙ্গেরীর পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনে, প্রসিদ্ধ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিকথায় এবং রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরীয় অনুবাদে

আমি উপরোক্ত হাঙ্গেরীর উৎসের খোঁজ এবং মূল্যায়ন করেছি বিভিন্ন লাইব্রেরিতে। সেখানে সমকালীন পত্রপত্রিকাদি রবীন্দ্রনাথের ওপরে সমস্ত বিশেষধরণের লেখা পর্যালোচনা করেছি। তারপরে, যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, বা যাঁরা তাঁর

সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁর মুখের কথা শুনেছেন এবং যাঁদের মনে এখনো তাঁর স্মৃতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসার মধ্যে জাগরূক—এমন সবাইকে খুঁজে বের করেছি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিমূর্তি এবং বালাতোন-ফুরর্দে তাঁর নিজের হাতে বসান গাছটিকেও বাদ দিই নি।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে হাঙ্গেরী এবং হাঙ্গেরীয় কবিরাও তাঁর জয়ধ্বনি করেন যখন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পেলেন। ১৯১৩ সালেই গীতাঞ্জলির কিছু অংশ এবং একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচনার অনুবাদ অবশ্য আজও চলছে।

বিশের দশকের প্রথম দিকে দুটি নিবন্ধ লিখেছিলেন এরভিন বাকতে। ইনি ছিলেন বিখ্যাত ভারতত্ত্ববিদ এবং অমৃতা শের গিলের মামা। এই লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন, সৃষ্টি, কর্ম, বিশ্ববীক্ষা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদির একটি ছবি পাওয়া যায়। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে বাকতে নিজের মতের কিছু পরিবর্তম করে তাঁর তৃতীয় রবীন্দ্র আলোচনায় কিছু সমালোচনামূলক মন্তব্য যুক্ত করেন। এই তিনটি লেখায় ১৯৪৫ সালের আগেকার উদারনৈতিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির এক বড় অংশের রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোভাব প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এগুলিকে উক্ত যুগের প্রকৃত দলিল বলে ব্যবহার করা যায়। এই লেখাগুলির একটা বড় গুণ হলো এই যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বিশেষক দর্শন সম্বন্ধে এরভিন বাকতের গভীর জ্ঞান তাঁকে কোনরকম অসমঞ্জস সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে বাধা দিয়েছে। অবশ্য সমসাময়িক কিছু ধারণা তাঁর মধ্যে বিরূপতার ঝোঁক-ও এনেছে। সে-সম্বন্ধে সমালোচনার দরকার এবং তা এই বইতেও আছে। এসময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিগত প্রথম মহাযুদ্ধ-প্রসূত এবং অবদমিত বিপ্লবসৃষ্ঠ রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত সঙ্কট। বাকতে অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে সেই সঙ্কট থেকে ত্রাণের উপায় খুঁজছিলেন

এবং বিশ্বাস করতেন যে তিনি তা পেয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের সামাজিক এবং দার্শনিক শিক্ষাধারায়।

১৯২৬ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ বুদাপেস্তে পৌঁছলেন তখন হাঙ্গেরীতে তাঁর খ্যাতি বলা বাহুল্য অতি উচ্চে। হাঙ্গেরীর রাজধানীতে তিনি যে কটি দিন কাটালেন তা তাঁর জনপ্রিয়তাকে আরো অনেক বাড়ালো। তিনিও সুযোগ পেলেন বক্তৃতা দেবার এবং অভ্যর্থনা সভা, ভোজসভা বা শিল্পকলার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বহু হাঙ্গেরীয়দের সঙ্গে মিলিত হবার। অনেক সাহিত্য এবং শিল্প অনুরাগীর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকার্যের প্রতি শ্রদ্ধাও গাঢ়তর হলো। আবার সেইসঙ্গে তাঁর সমালোচনাও প্রখরতর হলো। কখনো কখনো কিছু অনুষ্ঠানে অত্যুৎসাহ দেখা দিল, কখনো কখনো রাজনৈতিক শক্তিসমূহ সেই সব উপলক্ষ্যকে নিজেদের স্বার্থসাধনে কাজে লাগাল। তবে আসল ফল নিঃসন্দেহে সমর্থনেই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি বহু হাঙ্গেরীয়র হৃদয়ে দৃঢ় রূপ নিল, এবং বালাতোনফুরদে কবির স্বহস্ত রোপিত গাছটির মধ্যে তার একটি দৃশ্যমান নিদর্শন থেকে গেল।

আমি গাবোর লিপতাকের পুস্তিকাটির সাহায্যে অসুস্থ কবির বালাতোনফুরদের অবকাশ যাপনের দিনগুলি (সেখানে তিনি আরোগ্যলাভ করেন হাঙ্গেরীর নামী হৃদযন্ত্র-বিশেষজ্ঞদের হাতে) ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমি নানা খবরের কাগজ এবং পার্টির মুখপত্রাদির সাহায্যও নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরীবাসের শেষ ক'দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য।

ইস্তভান জারোরজস্কি নামে এক রোমান ক্যথলিক ধর্মতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত বিষোদগার করে যে বইটি লেখেন সেই চিত্তাকর্ষক দলিলটি-ও আমি বেশ কয়েকবার খুঁটিয়ে পড়েছি। আশ্চর্যের কথা যে (এরভিন বাকতের পূর্বোক্ত লেখাগুলি সত্ত্বেও) এই বইটি এখনো এই বিষয়ে সবচেয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ কাজ জাবোরজস্কি রবীন্দ্রনাথের মহৎ কবিত্বকে উপযুক্ত স্বীকৃতি

দিয়েছেন সত্য কিন্তু, তবুও তিনি তাঁকে মতাদর্শের ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক শত্রু বলে গণ্য করেছেন, ধরে নিয়েছেন তাঁর প্রভাব হাঙ্গেরী এবং সাধারণভাবে ধর্মজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। কিছু আগে ফ্রান্সে সুরু হওয়া খৃষ্টানী রবীন্দ্র বিরুদ্ধতার এবং তার হাঙ্গেরীয় পটভূমিকার সঙ্গে ঐ লেখার কতটা মিল আছে বা নেই তা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। পঞ্চাশ বছর পরে, মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হাঙ্গেরীর বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থায় আজ অবশ্য আমি জাবোর-জস্কিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাই এবং মনে করি তাঁর লেখায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘাতই প্রতিবিম্বিত বলে ধরে নিলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও খৃষ্টধর্ম বিষয়ক প্রশ্নটি খুবই ভাববার মতো এবং ঐ লেখাটি তাতে ব্যাপকতর ভাবে খানিকটা আলোকপাত করে। উক্ত সমালোচনাটি ঠিক গোঁড়ামি বা সমর্থন ভিক্ষার তর্ক প্রসূত নয়। এটি দর্শনশাস্ত্র ঘেঁসা এবং হাঙ্গেরীর দিক থেকে রাজনীতি রঞ্জিত।

হাঙ্গেরীয় প্রোটেস্টান্টদের কাছ থেকে যে সাড়া এসেছিল তাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। অন্যান্য দেশেও এই ধরনের সাড় দেখা দিয়েছে এবং আমি তা অনুধাবন করার চেষ্টা করব মহৎ চিন্তাবিদ অ্যালবের্ট কোরাইটজারের প্রসঙ্গে।

তিরিশের দশকের শেষাশেষি অ্যানতাল সুজেরব নামে একজন গুণী সাহিত্য-ইতিহাসজ্ঞ এবং উদারনৈতিক আর মানবতাবাদী মানুষ-(উনি ইংরেজি সাহিত্যেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন) তখন ১৯৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস বলে বইটি নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করেছিলেন খুব লক্ষণীয় নতুন ভাবে। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত ঠেকে। তাই আমি তার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করেছি।

সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর নতুন সব খণ্ড বেরিয়েছে: আবার পূর্বতন সংস্করণের পুনঃপ্রকাশও ঘটেছে গত ৩৭

বছরে। তবে রবীন্দ্রনাথের ওপর কাজ খুব কমই হয়েছে এবং গ্রন্থাকারে যা পাওয়া যায় তা হলো গাবোর লিপতাকের ছোট কিন্তু জনপ্রিয় নিবন্ধটি।

এই প্রসঙ্গে এডিথ টথ নামে এক প্রাচ্যবিদের লেখা একটি ভূমিকা (এটি আছে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত বিরাট রবীন্দ্রস্মারক গ্রন্থটিতে) এবং জোজেফ ভেকেরডি লিখিত বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধটির কথা বলতে হয়। এই দুটিকে রবীন্দ্রনাথের ওপরে বর্তমান কালের মতামতের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এদের মধ্যে নতুন কোন তথ্য নেই, আছে ছোট ছোট মন্তব্য এবং ভাবনা।

অধ্যাপক ইস্তভান সোটার বা অধ্যাপক লাস্‌জলো কারদোম প্রভৃতি পণ্ডিত, সাহিত্যিক ইতিহাসবিদ এবং বিশ্বসাহিত্য বিশেষজ্ঞরা রবীন্দ্র-স্মারক প্রবন্ধ হিসেবে যা লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে পরিণত চিন্তার ফল এবং কী কী কারণে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পাঠক এবং মানবজাতির কাছে এত মূল্যবান তার নির্দেশ এতে ভালভাবেই পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধাদি ভারতীয় সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশক এবং বৃহত্তর গবেষণার পথ প্রদর্শক।

একটি বিষয়ে আমি পাঠকদের সাবধান করে দিতে চাই তা হলো মাতিয়াস মাত্রাই-এর নিতান্ত সাধারণ এবং যুক্তিহীন মন্তব্যে ভারাক্রান্ত প্রবন্ধটি। দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটি খুবই তাড়াতাড়িতে লেখা এবং গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। অজস্র ভুল এবং সর্বজনপরিজ্ঞাত সাধারণ মন্তব্যে এটি ভর্তি। এর কিছু ভাল দিক আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি।

হাঙ্গেরীয় গ্রন্থাদি ছাড়াও আমার পক্ষে কিছু বই অপরিহার্য বলে ঠেকেছে। যে বইটির কাছে প্রাথমিক তথ্যাদি এবং চমৎকার সমা-

লোচনামূলক ব্যাখ্যার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ তা হলো অ্যালেক্স্ আরনসনের 'রবীন্দ্রনাথ থ্রু ওয়েষ্টার্ন আইজ' (প্রথম প্রকাশ এলাহাবাদ ১৯৪৩)। এই বই-এ বাকতের প্রধান কাজ এবং অন্যান্য হাঙ্গেরীয় লেখার উল্লেখ আছে। আমি আরনসনের কাছ থেকে অনেক চিন্তার খোরাক এবং উদ্দীপনা লাভ করেছি। আশ্চর্য লাগে রবীন্দ্রগবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ কোন উত্তরসূরী দেখা গেল না। যতদূর জানি তাঁর বইএর পুনঃপ্রকাশনাও এক্ষেত্রে কোন পারবর্তন ঘটায় নি।

আরেকটি বই-এর শরণাপন্ন হতে হয়েছে আমাকে। সেটি হলে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'হিমসেলফ আ ট্রু পোয়েম : আ ষ্টাডি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর।' এই বই-এ ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ম্লান হয়ে যাওয়ার কারণগুলি সুস্পষ্ট করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্ববীক্ষা এবং ধর্মীয় প্রভাবের কথাও বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

বিদেশীদের দ্বারা রবীন্দ্র-আলোচনার সঠিক রাস্তার নির্দেশ পাওয়া যায় নানান মন্তব্য বা উক্তি থেকে যা করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম করা সমসাময়িক কবি এজরা পাউণ্ড এবং ইয়েটস কিংবা ভারতের ধর্ম-আন্দোলনে বিশেষজ্ঞ কারকুহার বা রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং সংস্কৃত সাহিত্য বিশারদ অধ্যাপক মরিৎস উইণ্টারনিটস্।

রবীন্দ্র জীবনী হিসেবে প্রধান উৎস গ্রন্থ হিসাবে পেয়েছি কৃষ্ণ কৃপালনীর 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর : আ বায়োগ্রাফি'। বইটি আমায় খুবই সহায়তা করেছে।

সার্বিক আধুনিক ব্যাখ্যার জন্য আমি ভি. এস. নারাভানের 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু রবীন্দ্রনাথ টেগোর' (দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতা-মাদ্রাজ, ১৯৭৭) পড়েছি। নানা সমস্যার নিরসন করতে টেগোর সেণ্টেনারি ভলিউম (হোসিয়ারপুর ১৯৬১) সাহায্য করেছে। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রভূত ঋন করেছি সুকুমার সেনের 'হিষ্ট্রি অব বেঙ্গলী লিটরেচারের' কাছে এবং ঐ একই

উদ্দেশ্যে পড়েছি ভি লেসনীর 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর, পার্সোনালিটি অ্যাণ্ড ওয়ার্কস' (লণ্ডন, ১৯৩৯)।

দর্শনগত কিছু কিছু প্রশ্নে আর. সি. জেহ্নার এবং ফ্রিটস স্টালের মতামতগুলির দিকে মনোনিবেশ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দূর প্রাচ্যের যোগাযোগের বিষয়ে সম্প্রতি যে সব দিক ছোঁয়া আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বুলগারিয়া সফরের যে বিবরণী বেরিয়েছে, তাদের-ও বাদ দিইনি। একাধিক প্রশ্নে শেষোক্ত বইগুলি আমায় সাহায্য করেছে। প্রাগে অনুষ্ঠিত লেসনি শতবার্ষিকী সম্মেলনের উপাদানাদি অবশ্য এখনো অপ্রকাশিত।

হাঙ্গেরী বিষয়ে যতটা প্রাসঙ্গিক জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনাকে আমি সেই পরিমানে আলোচনার মধ্যে এনেছি। এ-সম্বন্ধে অবশ্য কোন সর্বাঙ্গীন বিবরণী নেই। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর আলোকপাত করার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে ইউরোপীয় দর্শনের মধ্যে যেতে হয়েছে।

প্রধান অধ্যায়গুলির একেকটি সংক্ষিপ্তসার সংযোজন করে দিয়েছি যাতে কিছু সিদ্ধান্তে আসতে এবং রবীন্দ্র-ভাবমূর্তিকে দৃষ্টিপটে আনতে পারা যায়। ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা এবং ভুল ধারণা এই দুইএর প্রভেদ বজায় রাখতে চেষ্টার কার্পণ্য করি নি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে—প্রথমত, হাঙ্গেরীতে আসার সমকালে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তিটি কী ছিল তা ফুটিয়ে তোলা এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর এক নব ভাবমূর্তি সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাব করা। দুটি উদ্দেশ্যই অবিচ্ছিন্ন।

আমি চেষ্টা করেছি কিছু নিজস্ব মত দিতে। কখনো কখনো তা হয়তো প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধে গেছে। কিন্তু, এ কথাও বলব যে ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসাহী ছাত্র হিসেবে এবং ভারতে হাঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে আমি পরিচালিত হয়েছি রবীন্দ্রনাথের প্রতি, শুধু তাই নয়, তিনি যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ তার

প্রতি এবং হাঙ্গেরীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমার অটুট ভালবাসার দ্বারাও আমি প্রভাবিত হয়েছি। তাছাড়া বিদ্যাজীবী-সুলভ নিরপেক্ষতাও আমি বজায় রাখতে চেয়েছি।

পরিশেষে বাছাই করা হাঙ্গেরীয় বিশেষ সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী এবং হাঙ্গেরীয় অনুবাদের সূচীটি সন্নিবিষ্ট হলো তাঁদের জন্য যাঁরা এ-সম্পর্কে উৎসের সন্ধান চান এবং আরো কাজ করতে ইচ্ছুক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় এবং হাঙ্গেরীয় পাঠক উভয়েই রবীন্দ্র-জগতের মধ্যে গভীরতর দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারবেন এবং কোন কোন অজানা তথ্য সকলের সামনে আসবে।

বিদেশীর মাধ্যমে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের বাণী ও বক্তব্য ভাবতে গেলে মনে হয় যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং চিন্তাযোগ্য ব্যাপার। তা সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি ভারতে উজ্জ্বলতর করবে এবং হাঙ্গেরীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ভারত এবং প্রাচ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াবে। শেষ পর্যন্ত দুটি উদ্দেশ্যই একসঙ্গে মিলবে এবং সেই মিলন বিন্দু থেকে সুরু হবে মানবজাতির প্রকৃত এবং আন্তর্জাতিক মূল্যবোধকে গভীরভাবে অনুধাবন করা।

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত যোগাযোগ

যদিও অনেক অনুবাদ এবং আলোচনাদি বিশেষত এরভিন বাকতের লেখার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীতে সুপরিচিত ছিলেন, তবু-ও ১৯২৬ সালের ২৬শে অক্টোবর থেকে ১৩ই নভেম্বর অবধি তিনি যে হাঙ্গেরী সফর করেছিলেন, সেটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এরভিন বাকতের বইএ (মানুষ, শিল্পী এবং ঋষি রবীন্দ্রনাথ, বুদাপেস্ত, ১৯১১-২২) আছে যে এমন সফরের কথা ১৯২১ সাল নাগাদই উঠেছিল। সে বছর রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে এবং হাঙ্গেরীর কাছাকাছি কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। কিছু কিছু সাহিত্যানুরাগী তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিলেন, আবার কোন কোন গোষ্ঠিতে এর বিরুদ্ধ মতাবলম্বিরাও ছিলেন। তাঁদের কড়া বিরুদ্ধতা খুব পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ করলেন "ইণ্টেলেকচুয়াল ধরণের" এক লেখক। তাঁর আপত্তি "হিন্দু বিষ" নিয়ে, যা বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বশান্তির বাণীকে। নিতান্ত তিক্তভাবেই তাই বাকতে লিখেছিলেন: আজকের দিনের মানবজাতির মহানতম প্রতিভার প্রতি বামনোচিত আস্ফালনের পেছনে মনে হয় কিছু দায়িত্বশীল গোষ্ঠীর মত আছে। কাজেই সেবার রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরী আসা হলো না।

উপরে যে সব গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে তারা কাদের নিয়ে তৈরি তা আমাদের অবশ্য অনুমান করে নিতে হয়। এঁরা হলেন শাসক শ্রেণী এবং তাঁদের মতাদর্শগত সমর্থকরা—যথা: দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক চক্র, পোপের অতি সমর্থক কিছু ইণ্টেলেকচুয়াল এবং

হাঙ্গেরীয় ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধিরা। এঁরা ভুলতে পারেন নি যে রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন এবং এঁরা হাঙ্গেরীর উদার নীতিবাদী, আমূল সংস্কারকামী এবং সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তাতে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। সেই সময় এঁরা সবাই নিযুক্ত ছিলেন বিপ্লবের পরে হাঙ্গেরীতে পুরাতন শাসকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। এঁদের কাছে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল প্রায় অজ্ঞাত। আর তাছাড়া, বাঙলার পুনর্জাগরণে এবং বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার বিশেষ গুরুত্বও তাঁদের জানা ছিল না। সুতীব্র জাতি-ভেদের ধারণায় তখন রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্র ছিল পূর্ণ। সে ধারণাকে অস্বীকার করবার মতো হাঙ্গেরীর মানুষ স্বদেশে বা ইউরোপ ও আমেরিকায় নির্বাসিতদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন। এরভিন বাকতের বইটি ছিল বিংশ শতকের প্রথম দশকে সুরু উদারনৈতিক ঐতিহ্যের অনুগামী এবং ঐসময়ের সব মতাদর্শগত সংঘর্ষের একটি মূল্যবান দলিল।

অবশ্য এই অবস্থা বেশীদিন চলল না। হর্থি-শাসন প্রতিভাবান প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ইস্তভান বেথলেনের সাহায্যে আস্তে আস্তে অর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খানিকটা স্থিতি আনল, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতি করল। তিনি উন্মুক্ত-দ্বার নীতি প্রবর্তন করলেন। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স তাতে সদর্থকভাবে সাড়া দিল, হাঙ্গেরীয় জাতীয় ব্যাঙ্ককে কাজ করতে দিল এবং হাঙ্গেরীয় মুদ্রার দাম বেঁধে দিল। এই দুই দেশ সাদা চামড়ার অত্যাচারকে ঘৃনার চোখে দেখত। তাই আভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধবাদীরা খানিকটা জায়গা পেলেন, বুদ্ধিজীবীরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছু কিছু প্রগতিশীল সাহিত্যিক কলাবিদ হাঙ্গেরীতে ফিরে এলেন; পত্রপত্রিকার নীতিও উদারতর হলো। আবার হাঙ্গেরীর মধ্যে যাঁরা ছিলেন সবচেয়ে রক্ষণশীল, তাঁরা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভাব করার জন্য

হাত বাড়িয়ে দিলেন, জার্মানীকে ঘেঁসে থাকার ঝোঁকটা কিছুকালের জন্য থেমে গেল। হাঙ্গেরীর সংশোধনবাদীদের পক্ষে প্রথম সমর্থন এল মুসোলিনীর ফ্যাশিস্ত শাসনের কাছ থেকে। এই সব থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯২৬ সালে ইউরোপে এলেন তখন যেন একটা অদ্ভুত ধারণায় দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। নোবেল পুরস্কার-জয়ী রবীন্দ্রনাথকে বুদাপেস্তে দেখে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর বুদ্ধি-জীবিরা খুশী হয়েছিলেন। কিছু রাজনীতিক বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধ-বাদী বলে রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন এবং অভিনন্দন জানালেন। থিয়সফিষ্ট এবং বৌদ্ধ মতাবলম্বী কয়েকটি ক্ষুদ্র অধ্যাত্মবাদী দল চাইলেন রবীন্দ্রনাথকে ভারতের ঋষি হিসেবে দেখতে এবং তাঁর কাছ থেকে মনের মতো কথা শুনতে। তখনকার একটি সঠিক নমুনা হচ্ছে ভিলমোস জোলতানের উক্তি। ১৯২৬-এর ৩১শে অক্টোবর তিনি উজ আইজোকে এইভাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেন: 'তিনি হাজার বছরের পুরাতন এক ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। তাই তাঁর পদবী হচ্ছে ডিউক (!)·····। তাঁর ইউরোপে বিভিন্ন সফরের লক্ষ্য হলো হিন্দু আর ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলন এবং মানবতাবাদ আর জাতি জাতিতে বোঝাপড়া ঘটানো।'

সংক্ষেপে বলা যায় এই সমস্ত অবস্থার ফলেই রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীতে এক পরম উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করলেন। তাঁকে ঘিরে জড়ো হলো অনেক আশা। নানান মানুষ চাইলেন তাঁকে দেখতে তাঁর কথা শুনতে, তাঁর থেকে অনুপ্রেরণা পেতে। আবার কেউ কেউ চাইলেন তাঁর মধ্যে তাঁদের মতাদর্শের, এমন কি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষারও সমর্থন।

ভূমিকায় যে রবীন্দ্র বিষয়ক রচনাদির কথা বলেছি তাতে রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরী সফরের দৈর্ঘ এবং কার্যসূচী সম্বন্ধে কোন যথাযথ তথ্য নেই। এক্ষেত্রে নিকৃষ্টতম উদাহরণ হলো মাতিয়াস মাত্রাই-এর লেখা। তাতে বলা হয়েছে তাঁর ১৯২৫ সালের (!) এক সফরের

কথা এবং আরেকটিরও বিষয়ে যা নাকি বেশ কিছু মাস (!) ধরে চলেছিল ১৯২৬-এ। এমন কি, হাঙ্গেরীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য নামে বেশ দলিল সমৃদ্ধ বইটিতেও গেজা বেথলেন ফালভি মেনে নিয়েছেন (শ্রীমতী শিখা গুহের এক গবেষণার ভিত্তিতে) যে রবীন্দ্রনাথ নাকি বালাতোনফুরর্দ থেকে ২৭শে নভেম্বর এক চিঠি লিখেছিলেন।

আমি ঐ সফরের চিত্র তুলে ধরব 'আজ্ এসত, পেস্তই হিরলাপ, ম্যাগিয়ার হিরলাপ, উজ্ ইদোক, নিয়ুগাৎ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন, নানা ব্যক্তির স্মৃতিচারণ এবং ২৭শে অক্টোবরে তাঁর বক্তৃতা সভার জন্য ছাপা নিমন্ত্রণলিপি থেকে। ধারাবাহিকভাবে আমি সব ঘটনা অনুসরণ করব তাঁর বালাতোনফুরর্দ যাওয়া অবধি এবং পরে ১১ই থেকে ১৩ই নভেম্বর অবধি যখন তিনি হাঙ্গেরী থেকে জাগরেব রওনা হলেন। বালাতোনফুরর্দ পর্বের জন্য আমার ভিত্তি হলো গাবোর লিপতাকের ছোট বইটি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভেসজপ্রেম ১৯৬১) এবং বালাতোনফুরর্দ শহর কাউন্সিল থেকে ব্যক্তিগত চিঠির আদান-প্রদান। এছাড়া কার্যসূচীর ওপরেও কিছু কিছু মন্তব্য করেছি।

১৫ই মে ১৯২৬, রবীন্দ্রনাথ নেপলস্ রওনা হন ইটালি সফর করতে। ফাশিস্ত নেতা মুসোলিনী তাঁর সম্মানে এক বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। এই ক্ষুদ্র সফর কিন্তু যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয় এবং রবীন্দ্রনাথকে ইটালি থেকে সুইটজারল্যাণ্ডে পৌছনোর পরে একটা কৈফিয়ৎ-ও দিতে হয়। সুইটজারল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রীয়া আসার আগে রবীন্দ্রনাথ যান ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী (সেখানে তিনি ডারমসভাটে ছিলেন কাউণ্ট কেইসারলিং-এর সঙ্গে) চেকোস্লোভাকিয়া (এখানে তাঁর ডাকঘর অভিনীত হয়) এবং অস্ট্রীয়া।

ঠিক কোথায়, কখন ও কিভাবে তিনি হাঙ্গেরীতে আসতে মনস্থ

করেন তা ঠিক জানা যায় না। তাঁর জীবনী প্রণেতা কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন তাঁকে লেক বালাতোনের তীরে এক স্যানাটোরিয়ামে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল কারণ সেবারকার সফরের ধকলে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য হাঙ্গেরীয় সূত্র থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে তিনি যখন ভিয়েনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন এক চিকিৎসক তাঁকে বুদাপেস্তে বিশ্ববিখ্যাত হাঙ্গেরীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রোফেসার সান্দোর ফোরানিই-কে দেখাতে পরামর্শ দেন। আবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর ডাইরিতে ইটালী সফরের পরে সুইটজারল্যাণ্ডের সেণ্ট মরিসে কিন্তু হাঙ্গেরীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা লিখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে. রবীন্দ্রনাথ কারোর নাম করেন নি বা হাঙ্গেরী থেকে আসা কোন নিমন্ত্রণের উল্লেখ করেন নি। সেখানে তাঁদের প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক বি. হুবারম্যান-এর সঙ্গে দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ হুবারম্যানকে হাঙ্গেরীয় ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পোল্যাণ্ডের লোক। তাই এই বিবরণের বিশেষ মূল্য নেই।

পেস্তি হিরলাপের প্রতিবেদন অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ভিয়েনা থেকে বুদাপেস্তে এসে পৌঁছান ১৯২৬ সালের ২৬ শে অক্টোবর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্রবধু প্রতিমা দেবী, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এবং অধ্যাপক-জায়া রাণী মহলানবীশ। আর ছিলেন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত ফেরেনস জায়তি। রবীন্দ্রনাথ ওঠেন সহরের সবচেয়ে বিলাস বহুল হোটেল গেলাতে। সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ জানান যে হাঙ্গেরীয় জাতির প্রতি তাঁর মনোভাব অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন।

ম্যাগিয়ার হিরলাপ নামে কাগজ অনুযায়ী তিনি কেলেতি পালিয়াবুদভাব (বুদাপেস্ত ঈষ্ট) ষ্টেশনে নামেন ২৬ শে অক্টোবর সন্ধ্যে ৭ টায়। তাঁকে চমৎকার অভ্যর্থনা জানান হয়েছিল। হাঙ্গেরীয় নিমন্ত্রণ কর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন বুদাপেস্ত সহর কাউন্সিলের প্রতিনিধি ডাঃ জেনো লোরমেয়ার, সরকারী ভ্রমন-

বিভাগের ডিরেক্টর দেজলসা জিলাহি, হাঙ্গেরীর বিদেশ বিষয়ক সংস্থার সম্পাদক ডাঃ জোজেফ নেজসি, এবং হাঙ্গেরীয় নাট্যকার সংঘের সভাপতি প্রখ্যাত লেখক জ.সোল্ট হারসান্য়ী। হারসান্য়ী তাঁর ভাষনে বলেছিলেন: "আমাদের মনে হচ্ছে যেন এক প্রিয় আত্মীয় তাঁর স্বজনদের দেখতে এসেছেন, যাঁরা অনেক দিন আগে তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে চলে এসেছেন"। ফেরেনস জায়তিও ভাষণ দেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরী ভ্রমনসূচীর প্রধান ব্যবস্থাপক পেতোস্কি সোসাইটির প্রতিভু।

প্রথমে এটিকে মনে হবে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাদির জোরালো সহায়তায় আয়োজিত এক সরকারী অভ্যর্থনা সভা। পেতোস্কি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সালে। এটি একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান। এর কর্মধারা নিবদ্ধ ছিল সান্দোর পেতোফিকে (১৮২৩—১৮৪১) নিয়ে। তিনি ছিলেন হাঙ্গেরীর এক মহত্তম কবি-বিপ্লবী এবং আজও হাঙ্গেরীর মুক্তি এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-এর এক মৃত্যুহীন প্রতীক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নানান সুপরিজ্ঞাত কারণে হাঙ্গেরীতে এসেছিল রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব। তা জাতীয়তাবাদের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। তবে সেই জাতীয়তাবাদ সকলের পক্ষে সমার্থক ছিল না। ফেরেনস জায়তি (১৮৮৬-১৯৬১) ছিলেন এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব, আবার গিউলা পেকার (এর কথা পরে আসবে) ছিলেন হর্থি শাসনের এক প্রধান ব্যক্তি। জায়তি ছিলেন কলাকার, ভাল চিত্রকর, ধর্মতত্ত্বে শিক্ষিত এবং প্রাচ্য গবেষণায় উৎসাহী। হাঙ্গেরীয় জাতির মূল আস্তানা কোথায় ছিল সেই অসমাধিত সমস্যা তাঁর চিন্তাকে জুড়ে থাকত। এই মৌলিক প্রশ্ন একাধিক প্রজন্মের হাঙ্গেরীয় পণ্ডিতকে উদ্দীপ্ত করেছে যাঁদের অন্যতম ছিলেন আলেকসান্দর সোমা দ্য কোরস (১৭৮৪—১৮৪২) এবং ঐ সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চায় মদৎ দিয়েছে। জায়তীকে নাড়া দিয়েছিলেন মধ্যযুগের সেইসব রচনাকার যাঁদের ধারনা ছিল অ্যাটিলা যে হুণদের

সম্রাট হাঙ্গেরীয়রা তাদেরই বংশধর। হাঙ্গেরীয় ইতিহাস চর্চায় এই মতবাদের প্রাবল্য বেশ কয়েক শতক ধরে খুব বেশী ছিল। আজকের হাঙ্গেরীতে যে অ্যাটিলার হুনদের বাস ছিল এবং ঐ হুনদের সামাজিক এবং সামরিক অনেক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রোটো-হাঙ্গেরীয়দের মতো নানা যাযাবরদের বেশ মিল ছিল—তার থেকেই উক্ত মতবাদের উদ্ভব। জায়েতি উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে হুণদের প্রকৃত ভূমিকাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। রাজপুতজাতির উদ্ভব নিয়েও তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। প্রাচীন হাঙ্গেরীয় জাতির মধ্যে তুর্কদের কিছু অংশের যোগের সম্ভাবনা (যা নিয়ে পণ্ডিতরা বহুপ্রজন্ম ধরে কাজ করছেন কিন্তু আজও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি) তাঁকে আবেগ প্রবণ করে তুলত। ফলে তিনি হাঙ্গেরীয়দের সম্পর্ক খুঁজে পেতেন গুজরাতে, রাজস্থানে। তিনি ১৯২৯-এ ভারতে গিয়েও কাজ করেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর প্রধান সব রচনায়: ভারতের সঙ্গে আমাদের যোগ (বুদাপেস্ত ১৯২৯), ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমস্যাদি (বুদাপেস্ত ১৯৪৩)। এই মতবাদ যে ভাবে জায়তি উপস্থাপন করেছিলেন তাকে সমূলে খণ্ডন করেছেন অধ্যাপক লাজলো গাল এবং অধ্যাপক জোজেফ স্লিভ্‌ট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা। জায়তি হাঙ্গেরীতে পার্সি সংস্কৃতি প্রচারেও ব্রতী হন এবং ১৯২৫-এ বোম্বাই-এর নামী পার্সি পণ্ডিত জে. মোদিকে হাঙ্গেরী নিয়ে আসেন। জায়তি ছিলেন বুদাপেস্ত মিউনিসিপাল লাইব্রেরীর প্রাচ্য বিভাগের প্রধান। সেখানকার সংগ্রহকে তিনি বহু গুণ বর্ধিত করেন। সেই সংগ্রহ অনেকটাই এখন হাঙ্গেরীর বিজ্ঞান আকাদেমীর প্রাচ্য বিষয়ক সংগ্রহের অন্তর্গত। জায়তিকে সমর্থন করতেন হাপস্‌বুর্গ রাজ-পরিবারের আর্কডিউক জোজেফ ফেরেনক। তিনি জায়তির বইএর ভূমিকা লিখে দেন এবং হুণ-হাঙ্গেরীয় একাত্মতায় বিশ্বাস করতেন। ১৯২৬-এর ২৮শে অক্টোবরের পেস্ত হিরলাপ কাগজে গেলার্ট

হোটেলের সামনে তোলা এক ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রুপ ছবিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জায়তি এবং আর্ক ডিউককে দেখা যায়। জায়তি নিঃসন্দেহে বহুগুণের আকর ছিলেন এবং রবীন্দ্রসফরের সব ব্যবস্থাই দক্ষভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি হয়তো রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—হাঙ্গেরীয় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের কথা, হাঙ্গেরীয় ইটালি সম্পর্কের কথা। এমনকি হয়তো হর্থি শাসনের সোভিয়েত বিরোধী নীতির কথাও বলেছিলেন, কেন না সফরের সুরুতেই ম্যাগিয়ার হিরলাপ পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের একটি স্মরণীয় সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন যে সোভিয়েত বিপ্লব তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেছে। একথা প্রায়ই তিনি স্বীকার করেছেন এবং তার ফলে অনেক সময় অপ্রিয় অবস্থাতেও পড়েছেন। এর পর থেকে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ হয় বলশেভিক আর নয়তো তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি খুব গভীর। "আমি খোলাখুলিভাবে বলতে চাই যে জারের সাম্রাজ্যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যে নতুন জগত গড়ে তুলেছে তার প্রতি আমার আগ্রহ সুগভীর তাই আমি স্বচক্ষে রাশিয়ার বিষয় অনুধাবন করতে চাই।" ফেরেনস মোলনার (১৮৭৮—১৯৫২) রচিত সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুবই উচ্চধারণা পোষণ করতেন। তখন হাঙ্গেরীতে এবং বিদেশে মোলনারের খ্যাতি আকাশচুম্বী। রবীন্দ্রনাথ ইয়েল্লি স্ত আরানয়ী নামে এক বেহালাবাদিকার নামও করেন। শেষে তিনি মুসোলিনী সম্বন্ধও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে মুসোলিনী শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, হয়তো দেশের পক্ষে তিনি কাজে লাগতেও পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ত শাসন ব্যবস্থার কোন প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের ইটালি সফরের পেছনে যে প্রবণতা ছিল তার জন্যে তাঁকে সুইটজারল্যাণ্ডে বসে কৈফয়ৎ দিতে হয়েছিল। তার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু হাঙ্গেরীতে সাক্ষাৎকারে তিনি এ বিষয়ে যা

বলেন তাতে দেখা যায় তাঁর রাজনৈতিক বাস্তববোধ যেমন সঠিক তেমনি ইউরোপীয় ঘটনা বিকাশের সম্বন্ধে জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট। তিনি পূর্বোক্ত বক্তব্য পেশ করেন এমন এক দেশে যেখানে সমাজতন্ত্র বিরোধী-শক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তবে আগে যে পরিবর্তিত আবহাওয়ার বিষয়ে বলেছি, সেই আবহাওয়ায় তাঁর বক্তব্য কাগজে বেরিয়েছিল এবং কোন কড়া মন্তব্য ছাড়াই। হাঙ্গেরীর কোন পত্র-পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের ভাষণাদি সমালোচিত হয় নি।

২৭শে অক্টোবর দিনটি রবীন্দ্রনাথের যেমন ব্যস্ততায় কেটেছে তেমনি আবার স্মরণীয়ও ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সম্বলিত নিমন্ত্রণ পত্র অনুযায়ী (এটি অনুগ্রহ করে ব্যবহার করতে দিয়েছেন ডাঃ পাল জার্জলি) কবি সেদিন 'সভ্যতা ও বিবর্তন' নামে এক বক্তৃতা দেন। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা হয়েছিল কনসার্ট হাঙ্গভারসেনি-ভাল্লালাতে আর. টি. নামে এক বেসরকারী সংস্থার তরফে। এটি ইমরে কুন-এর প্রধান ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। বক্তৃতা প্রারম্ভে পরিচয় প্রদানের ভার ছিল ফেরেনস জায়তির ওপরে আর অনুবাদক ছিলেন গিওর্গি কেমেনি নামে এক লেখক।

খবরের কাগজ থেকে এই বক্তৃতা এবং শ্রোতাদের কেমন লেগেছিল তার কিছু ধারণা হয়। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন দু'জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী—কবি ও কথাসাহিত্যিক দেজমো কোজতোলানয়ী (১৮৮৫-১৯৩৬) এবং প্রেসবিটেরিয়ন বিশপ লাস্‌জলো রাভাস্‌জ (১৮৮২)। তাঁরা নিজেদের মনের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এখানে আমি বক্তৃতাটির ব্যাপারেই সীমিত থাকব এবং সাহিত্য সমালোচনা, মূল্যায়ন এবং দর্শনগত সমালোচনার কথায় পরে আসব।

কোজতোলানয়ীর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল নৌগাৎ-এ ১৬ই নভেম্বর ১৯২৬; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরী থেকে বিদায় নেবার

পরে। এতে রবীন্দ্রনাথের প্রথমে বক্তৃতা এবং পরের আবৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ দেখান হয়। শ্বেতশ্মশ্রু শোভিত কবিকে তিনি বর্ণনা করেন প্রাচ্যের প্রাচীনতম প্রতিনিধি হিসেবে। প্রকৃত সভ্যতা, মহান আধ্যাত্মিকতা এবং পারস্পরিক ভালবাসার প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে কবির বাণী শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয়েছিল এসব সমস্যা তাঁর এবং ইউরোপীয়দের কাছে খুবই পরিচিত। কিছুটা নিরাশভাবে তিনি মন্তব্য করেছেন: আমরা এইসব সমস্যা জানি, তাদের কারণ জানি, সমস্যাপূরণের উদ্দেশ্যও জানি। খালি জানি না কী করে সমস্যা পূরণ হবে। কবি নিজেও কোন উপায় খুঁজে পান নি। হাঙ্গেরী আর এশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিগুলির ওপর জোর দিয়েছিলেন তা কোজতোলানয়ীর সমর্থন পায় নি। তিনি দোমনা হয়ে শেষ পর্যন্ত লেখেন: 'উনি কি এতই সরল যে বিশ্বাস করেন ওঁর তিরস্কারের দ্বারা উনি জগতকে বাঁচাতে পারবেন? নাকি, উনি মনে করেন যে আমরা একেবারেই শিশু এবং সে কাজ করতে অক্ষম? উনি কি ভাবেন যে ওঁর বক্তৃতা শোনার পর আমরা আমাদের ছেলেমানুষী দুষ্টুমি থামিয়ে দিয়ে একে অন্যের ওপর কামান গোলা ছোঁড়া বন্ধ করব? আমি এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করতে অপারগ।'

বিশপ লাস্‌জ্‌লো রাভাজ-এর বিশ্লেষণ খুবই সমালোচনামূলক। সেটি বড় করে পরে দেব। এখন তাঁর সাধারণ মন্তব্যাদির কথাই বলি। তিনি রবীন্দ্রনাথের উগ্র জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা এবং তাঁর কবিতার সৌকুমার্য আর মহত্বকে প্রশংসা করেন।

পেস্তি হিরলাপের বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হাঙ্গেরীয় অনুবাদে সভায় পড়েন ভিলমোস জোলতান এবং শেষে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও শোনানো হয়।

২৮শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান পরিদর্শনে। পেস্তি হিরলাপে ২৯শে তাঁর একটি ছবি বেরোয়। এটি তোলা হয় বুদা-র পুরোন দুর্গের ফিশার বাস্তিয়ন নামে এক অংশে,

যেখান থেকে হাঙ্গেরীর রাজধানীর একটা সার্বিক দৃশ্য চোখে পড়ে। দানিয়ুব নদীর ওপরে চলমান এক নৌকা নিয়ে নাকি রবীন্দ্রনাথ তখন একটি কবিতাও লেখেন!

ঐ-দিনই তাঁকে স্বাগত জানান হাঙ্গেরীয় পি. ই. এন. ক্লাবের সভাপতি আনতাল রাদো (১৮৬২-১৯৪৪)। এই সাক্ষাৎকার খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। রাদো ছিলেন দান্তে, পেত্রার্ক, শেক্সপীয়ার, ডিফো, বায়রন, ওয়াইণ্ড, রাসিন, কর্নেইল, গ্যেটে এবং শিলার ইত্যাদিদের খ্যাতনামা অনুবাদক, আবার গ্রীক, লাতিন, ইটালীয়, জার্মান, ইংরেজি, ফরাসী এবং ফার্সী ভাষায় পারদর্শী। তিনি ফিরদৌসির শাহনামার অনেকটাই হাঙ্গেরীয়তে রূপান্তরিত করেন এবং হাঙ্গেরীয় আর বিদেশী কবিদের একটি চমৎকার সিরিজ প্রকাশ করেন নিজের সম্পাদনায়।

ঐ সন্ধ্যায় বুদাপেস্ত সহরের প্রতিনিধিরা এবং হাঙ্গেরীয় শিল্পীরা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আর ভোজসভার আয়োজন করেন গেলার্ট হোটেলে। সেখানে অনুষ্ঠান সূচীতে প্রধান ছিল—দা গার্ডনার থেকে ইলোনা হোলোস-এর আবৃত্তি, সঙ্গে সঙ্গীত সহযোগিতা করেছিলেন ওতমার সাগোদি নামে সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত সমালোচক; খ্যাতনামা হাঙ্গেরীয় গায়ক ইমরে পাল্লো আর হাঙ্গেরীয় অপেরার শিল্পী ইজাবেলা নাগীর কণ্ঠে হাঙ্গেরীয় লোকগীত; দেনেস সিয়ি-র তারোগাতো বাদন (তারো গাতো ওবোর মতো যন্ত্র এবং এটি অষ্টাদশ শতকে প্রিন্স রাকোসির হ্যাপসবুর্গ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে খুব জনপ্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল); বেল্লা বোদি আর মিকলোস স্‌জেদি তাতার হাঙ্গেরীয় নাচ দেখান; প্রসিদ্ধ জিপসি ব্যাণ্ড বাজনাও শোনান হয় বেলা রাদিক্‌সের পরিচালনায় (উজ ইদকের একটি ছবিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ আর বেহালাবাদনরত বেলা রাদিকস); এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে বাঙলায় আবৃত্তি করেন একটি কবিতা, যা হাঙ্গেরীয়তে অনুদিত হয় নি।

হাঙ্গেরী সরকারের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন দুই আণ্ডার-সেক্রেটারী—রবার্ট কে কেরতেমজ, আর পাল পেত্রি। তাছাড়া ইংরেজিতে বলেন লেখক গুইলা পেকার (১৮৬৭-১৯৩৭)। তিনি ১৯২০ থেকে পেতোফি তারাসাসাগের সভাপতি। পেকার লেখক হিসেবে সফল হলেও খুব গুণী ছিলেন না। তবে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যেকার কালে হাঙ্গেরীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পড়াশুনো যথেষ্ট ছিল। নানা বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পড়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সাহিত্যে এবং পেতোফি তারাসাসাগের কাজেকর্মে তিনি সরকারী দক্ষিণ পন্থাকে চালু করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন উৎকট জাতীয়তাবাদী। তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারা এবং বুঝতে চাওয়াও অসম্ভব ছিল। উজ ইদকে প্রকাশিত এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তার মন্তব্যাদিতে এটি আরো ভালো দেখা যাবে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ছিল রক্ষণশীল আর তার সম্পাদক ফেরেনস হেরসেগ (১৮৬৩-১৯৫৪) ছিলেন হাঙ্গেরীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একজন মুখ্য ব্যক্তি। তিনি উঁচু দরের লেখক হলেও কিন্তু জাতীয়তাবাদের সংক্রমণ এড়াতে পারেন নি। তাঁর লেখা সমগ্র ইউরোপেই এবং সোভিয়েত ইউনিয়নেও পঠিত হতো।

পেকার তাঁর লেখায় নানান শ্লোগান আর বক্তাপচা উক্তির সঙ্গে কিছু চিত্তাকর্ষক উপকরণ মিশিয়ে ছিলেন। এখানে আমি খালি খুব চোখে পড়ার মতো মন্তব্যগুলির কথাই বলছি। বৃদ্ধ কবির চেহারা দেখে পেকার উদ্বুদ্ধ হন গঙ্গার ওপরে ভাসমান এক বৃহৎ তরীর সঙ্গে তাঁকে তুলনা করতে। আবার রবীন্দ্রনাথকে তিনি আরব্য উপন্যাসের পরিবেশে স্থাপন করেন। একটি জায়গায় তিনি রবীন্দ্রনাথের মুখকে তুলনা করেন মোর জোকাই-এর মুখের সঙ্গে। জোকাই (১৮২৫—১৯০৪) ছিলেন উনবিংশ শতকে হাঙ্গেরীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক; তাঁর খ্যাতি ছিল সারা ইউরোপে এবং তিনি সানদোর পেতোফির বন্ধু ছিলেন। এই প্রসঙ্গে

হীরেন মুখোপাধ্যায়ের 'হাঙ্গেরী পাষ্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' থেকে একটু তুলে দিই: "রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই হাঙ্গেরী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলেন। বিখ্যাত লেখক ও দেশপ্রেমী মোর জোকাইকে যখন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছিল, তখন ১৮৯৪ সালে সাধনাতে (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা) তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন এই কারণে যে হাঙ্গেরীয় সাহিত্যিকরা তাঁদের দেশের জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি, তাঁরা তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হন, তাঁদের সান্ত্বনা দেন এবং আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেন।" বত্রিশ বছর পরে যখন ভারতের এই ভ্রাম্যমান কবি হাঙ্গেরীতে কিছু দিনের জন্য যান তখন তিনি মনে করে জোকাই-এর স্মৃতিস্তম্ভে মাল্য অর্পণ করেন। পেকার অবশ্য নেহাৎ অগভীর ভাবে ওপরের সাদৃশ্যের কথাই ভেবেছিলেন। তারপর তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা এবং হুণ-হাঙ্গেরীয় মতবাদ তাকে বলালো: "আমি বুঝতে পারছি যে ভারতীয়রা আজ যেমন বৃটিশের তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষ হুণদের-ও ধৈর্যশীল, উৎপীড়িত দাস ছিল।" জিপসি ব্যাণ্ড তার মনোযোগ এড়ায়নি এবং তিনি ধরে নিলেন যে জিপসিরা রবীন্দ্রনাথের বাঙলার অনেকটাই বুঝতে পেরেছিল। এটাও তাঁর অত্যন্ত অগভীর দৃষ্টির পরিচায়ক। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে জিপসিদের ভাষায় ইন্দো-এরিয়ান শাখার সঙ্গে কোন উদ্ভবজনিত মিল আছে, তবুও উভয় ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাষাগত যোগাযোগ অসম্ভব। পেকার রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় এই অদ্ভুত বক্তব্যও আরোপ করেন: "জিপসিরা এবং তাদের শিল্প তুলে ধরেছে হাঙ্গেরীয় আর তাদের পূর্বপুরুষ হুণদের প্রকৃত বাসস্থান ভারতের মধ্যেকার সম্বন্ধকে।" তাই নাকি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার দেশ ছাড়া হাঙ্গেরীকে আমি বিশেষ করে নিজের মতো বলে মনে করি।" পেকারের শেষ কথা হচ্ছে: এই গঙ্গার তরীটি ইউরোপ ঘুরে এসেছে এবং সব জাতি তার সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়েছে। এবার সে এসে লেগেছে হাঙ্গেরীর ঘাটে। তার

কাব্যের উৎকর্ষ—যার মধ্যে রয়েছে সেডার গাছের কাঠে তৈরী সোনা বসানো বাক্সের গন্ধ যা আমাদের বিহ্বল করে, গানের সুরে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখছি আর ভাবছি—উনি কি শুধু কবি? উনি তো পুরোহিত, ঋষি, মহাত্মা, দর্শন-গুরু……।"

বেলা রাদিকস (১৮৬৭-১৯৩০) পরিচালিত জিপসি ব্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর শিল্পীদের সঙ্গীত নিশ্চয়ই অপূর্ব হয়েছিল। সঙ্গীত ইতিহাসের এক বিরাট পুরুষ, ফরাসী সঙ্গীতকার দেবুসি—যিনি আধুনিক সঙ্গীতের পথিকৃৎ এবং সঙ্গীতে ইমপ্রেশনিজমের প্রবর্তক, ১৯১০ সালে বেলা রদিকসকে শুনে মুগ্ধ হন। এই রদিকসই প্রিন্স অফ ওয়েলসের হাঙ্গেরী সফরের সময় অনেক রাত অবধি সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যে ৬টায় রবীন্দ্রনাথ যান ফেসজেক ক্লাবে। এটি একটি পুরোন ক্লাব এবং নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত। এখানে সাহিত্যিক এবং অন্যান্যরা হাঙ্গেরীর পি, ই, এন ক্লাব আর হাঙ্গেরীর নাট্যকার সংঘের নিমন্ত্রণে জমায়েত হন। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় ছিলেন একঘণ্টা। তাঁর সঙ্গে এখানে মিলিত হন আনতাল রাজো আর মেনিহার্ট লেঙ্গিয়েল। লেঙ্গিয়েল (১৮৮০) ছিলেন একজন জনপ্রিয় নাট্যকার এবং জাদুকর ম্যাণ্ডারিন নামে গল্পের লেখক—যে গল্পটি বেলা বারতোক রচিত জগদ্বিখ্যাত ব্যালেতে ব্যহৃত হয়। কোন বিবরণীতে আর কারো নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু নিশ্চয়ই অধ্যাপক গুইলা জেরমানুসকে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেরমানুস হাঙ্গেরীর পি, ই, এন ক্লাবের সম্পাদক এবং হাঙ্গেরী আর পূর্ব ইউরোপে পি, ই, এন আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। আনতাল রাদো আর মেনিহার্ট লেঙ্গিয়েল উভয়েই আধুনিক ইউরোপীয় এবং মার্কিনী সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট খবর রাখতেন। তাঁরা প্রাচ্যের সাহিত্যসমূহ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির নবতম বিকাশ অনুধাবন করতেন। লেঙ্গিয়েল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ওপরে তুফান নামে এক নাটক

লেখেন। এটির প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭০ সালে। লেঙ্গিয়েল ১৯৩১-এ দেশ ছেড়ে চলে যান ইংল্যাণ্ডে এবং পরে আমেরিকা আর ইটালিতে বাস করেন।

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল এবং ঠাসা কর্মসূচীর চাপে তিনি বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন। বালাতোন ফুরর্দে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক সানদোর কোরানয়ী। রবীন্দ্রনাথকে দেখতে লাগলেন ডাঃ স্মিড। তিনি ঐ হাসপাতালে একজন প্রধান ছিলেন এবং কয়েক বছর হলো মারা গেছেন।

বালাতোনফুরর্দ বালাতোন হ্রদের তীরে। হ্রদটিকে বলা হয় "হাঙ্গেরীর সাগর।" ট্রান্সদানিয়ুব অঞ্চলে এটি একটি নৈসর্গিক জাদু বিশেষ। গ্রীষ্মাবাস হিসেবে হাঙ্গেরীতে এই হ্রদ সবচেয়ে জনপ্রিয়। এর সুদীর্ঘ তীররেখা ধরে অবস্থিত নানান সুন্দর সুন্দর ছোট শহর এবং গ্রাম। এর উত্তরদিক জুড়ে পাহাড়ের শ্রেণী। সেখানে বাদাসকোনি নামে আগ্নেয়গিরি শিখরের কাছে প্রস্তুত হয় পৃথিবীর এক সেরা মদ। বালাতোনফুরর্দ ছোট্ট সহর এবং নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এখানে চমৎকার উষ্ণ প্রস্রবন আছে। মদের জন্য চমৎকার আঙ্গুর-ও এখানে ফলে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই গ্রীষ্মকালে এখানে দলবেঁধে আসতে শুরু করেন বহু হাঙ্গেরীয় বুদ্ধিজীবী। এ সহরে অনেক কবি, কথাসাহিত্যিক, অভিনেতা ও পণ্ডিতের বাস। তার মধ্যে আমি দু'জনের নাম করব। প্রথমতঃ ঔপন্যাসিক মোর জোকাই, দ্বিতীয়তঃ লাজোস লোক্‌জি এক গুণী ভূগোল বিশারদ, যিনি চীন-জাপানে অভিযানে যান এবং চীনা-তুর্কীস্তানের মরুভূমিতে সাংস্কৃতিক অঞ্চল আবিস্কার করেন। তাঁর এই অভিযানের মনোহারি বর্ণনা পাওয়া যাবে 'চীন সাম্রাজ্যের প্রদেশ এবং প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ' নামে বিশালাকারগ্রন্থে (বুদাপেস্ত ১৮৮৬)। স্যার অরেল স্টাইন (১৮৬২-১৯৪৩) যখন ভারত ও

চীনে যান তখন তাঁরই পরামর্শে প্রাচীন পুঁথি এবং পটের এক বিরাট সংগ্রহের উৎসে পৌঁছান। লোক্‌জি-র সমাধিস্থল বিশ্বের সকল বিদ্যার্থীদের পক্ষে তীর্থস্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ যে হাসপাতালে ছিলেন সেটি নির্মিত হয় খনিজ জল যেখানে বেরিয়ে আসে তারই ধারে। হ্রদটির কাছে আছে লিনডেন গাছের সারিতে ভরা এক মনোরম বীথি। অদূরেই রয়েছে ইয়েটিং করার নৌকার ক্লাব। হাসপাতালের জানলা থেকে হ্রদের পুরো দৃশ্যটি চোখ জুড়িয়ে দেয়। তবে হ্রদটি ঠিক কী রকম ধরণের? এর উপরিভাগ কখনোই সম্পূর্ণ শান্ত থাকে না আর এর রং নীল থেকে ধূসরনীল আবার তার থেকে ধূসর সবুজে ক্রমাগত বদলায়। বলা বাহুল্য, চিত্রকর বা নিসর্গপ্রেমীদের কাছে এসব খুবই দুর্লভ দৃশ্য।

নানান পরীক্ষা এবং তারপর সুচিকিৎসা রবীন্দ্রনাথকে অচিরেই অনেকটা সুস্থ করে তুলল। হ্রদের তীরে তিনি অনেকক্ষণ ধরে বেড়াতে সুরু করলেন। তাঁর মনেও স্বাভাবিক আনন্দ ফিরে এল। তাছাড়া কবির মনকে নাড়া দিয়েছিল এখানকার প্রাকৃতিক শোভা। এখানেই তিনি রচনা করেছিলেন ইংরেজি আর বাঙলায় লেখন-সংগ্রহ যেটি প্রকাশিত হয় বার্লিন থেকে। সুকুমার সেন এই বই-এর ব্লক বুদাপেস্তে তৈরি হয়েছে বলেছেন তা ঠিক নয়। সুকুমার সেন লেখনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে "এই চতুষ্পদী এবং দ্বিপদী সমূহে চিত্রকলাগুলি দেদীপ্যমান, ভাষার ঠাসবুনোনি এবং উজ্জ্বল্যও আশ্চর্যজনক, ইহারা চীনা মিনিয়েচার অঙ্কনের দুর্লভ সৌন্দর্যের কথা প্রায়শই স্মরণ করাইয়া দেয়।" রবীন্দ্রনাথের মূল ইংরেজি রূপ এইরকম :

"The departing night's one kiss on the closed eyes of morning glows in the star of dawn."

The freedom of the wind and the bondage of the stem join hands in the dance of swaying branches".

আমরা জানি যে বিভিন্ন জাতির শিল্প-বিদ্যা বা পুরাণে বৃক্ষকে জীবন এবং জীবনীশক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। ভারতেও এই ধারণা প্রচলিত। আবার তিভাদার কৃসোন্‌ত্‌ভারি কোজৎকা (১৮৫৩—১৯১৯) নামে বিংশশতকের এক বিশিষ্ট হাঙ্গেরীয় চিত্রকর (দিল্লীতে এর চিত্রাদির আলোকচিত্রের এক প্রদর্শনী হয় ১৯৮২-তে) বৃক্ষকে এই একই প্রতীক বলে গণ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ যে বালাতোন হ্রদের তীরে তাঁর হাসপাতালের সামনে এক বৃক্ষ-রোপণ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ১৯২৬-এর ৮ই নভেম্বর তিনি স্বহস্তে রোপণ করলেন একটি লিণ্ডেনের চারা গাছ। তার তলায় স্থাপিত হলো একটি স্মৃতিফলক। মূল ফলকটি আজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেটি আছে গাবোর লিপতাকের সংগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের এই উপলক্ষে লিখিত কবিতাটি ফলকে উৎকীর্ণ হলো। কবিতাটি হচ্ছে :

হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে,
সেদিন বসন্তে নব পল্লবে-পল্লবে
তোমার মর্মর ধ্বনি পথিকেরে ক'বে—
ভালোবেসেছিল কবি বেঁচেছিল যবে ॥

এই বৃক্ষরোপণের স্মারক হিসেবে আরো একটি ফলকও স্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মর্ম হলো—এই বৃক্ষ রোপণ তিনি করছেন তাঁর হাঙ্গেরীবাসের স্মরণে। এখানে তিনি যা পেয়েছেন তা আর কোথাও পান নি। এই সম্পর্ক আতিথ্যের চেয়ে বড় একাত্মবোধের সূচনা। তাঁর ধারণা এমন এক দেশে তিনি এসেছেন যা হৃদয়গতভাবে ভারতের খুবই কাছে।

আজ রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি গাছটির সামনে দাঁড়িয়ে আর তার দু'পাশে ফলক দুটি মূর্তির পাদদেশে প্রোথিত আছে। মূর্তিটির ভাস্কর শান্তিনিকেতনের রামকিংকর। এটি ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত হয় এবং ১৯৫৬-র ৮ই অক্টোবর বেলা ১১টায় এর উন্মোচন

অনুষ্ঠানে যোগ দেন বুদাপেস্তে ভারতীয় দূতাবাসের এবং হাঙ্গেরীর শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিনিধিরা। হাঙ্গেরীর শিক্ষাবিভাগীয় উপমন্ত্রী এনো মিহালীফি এবং ভারতের অনিলকুমার চন্দ ভাষণ দেন।

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতে ফিরে রবীন্দ্রনাথ পুরাণে বর্ণিত কিছু অনুষ্ঠান আবার সুরু করেন। কৃষ্ণ কৃপালানী লিখেছেন—"১৯২৮এর বর্ষাকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতনে দুটি ঋতু-উৎসব—বৃক্ষরোপণ আর হলকর্ষণ প্রবর্তন করেন। এই বর্ণাঢ্য উৎসব দুটি সরল অথচ শিল্পসম্মত অনুষ্ঠান। গান, নাচ এবং বৈদিক মন্ত্রসহ অনুষ্ঠান দুটি আজও বছরে বছরে আয়োজিত হয় প্রকৃতির উর্বরতা এবং যৌবনের চিরনবীনতার প্রতীক হিসেবে এবং এগুলিতে যোগ দিতে কাছের সব গ্রাম এবং কলকাতা থেকে দলে দলে লোক আসে।

বালাতোনফুরদে অবিস্মরণীয় কিছুকাল কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুদাপেস্তে ফিরলেন ১৯২৬-এর ১১ই নভেম্বর। সরকারী দিক থেকে ১২ই নভেম্বর ছিল রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরী সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেদিন হাঙ্গেরীর শাসনকর্তা মিলকোস হর্থি (তাঁর নাম ১৯২০ থেকে ১৯৪৪ সালের শাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত) আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়। আলোচনাকালে হর্থি জানান যে তিনি ভারতে ১৮৮৩ সালে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক প্রশ্নাদিতে তিনি নরম-গরমের মাঝামাঝি সুরে কথা বলেন। তাঁর মতে হাঙ্গেরী তখনো খুবই আহত; কিন্তু ধৈর্য আর শান্তিকামীতার সাহায্যে সে উজ্জ্বলতর কালে উত্তীর্ণ হবে। রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং হর্থির আশায় সায় দেন। তিনি বলেন—আত্মীয় হিসেবে তিনি আত্মীয়ের অতিথি হয়েছেন।

হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের শেষের কদিন কাটে বুদাপেস্তের লিগেট নামে এক সানাটোরিয়ামে। তিনি যখন জাগ্রেব রওনা হলেন তাঁর সহযাত্রী হলেন ফেরেনক জায়তি। তাঁকে ষ্টেশনে বিদায় দিতে

আসেন সরকারী ভ্রমণ বিভাগের কর্তা ভিকতর হুজকা আর হাঙ্গভারসেনি ভাল্লালাত কনসার্টদলের সদস্যরা। শেষোক্তরা আবার ষ্টেশনে একটি অনুষ্ঠানও করেন।

রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরী ভ্রমণ করে খুশী হয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতন ফেরার আগে তিনি এই মর্মে লিখেছিলেন: বুদাপেস্তের মতো সব স্থানে মানুষের তাঁর প্রতি মনোভাব এত আত্মীয়সুলভ এবং কোমল যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তিনি তা লাভ করেছেন বলে তার মনেই হয় না। এ যেন এক আশ্চর্য আত্মীয়তা-বোধ জনিত আকর্ষণের স্বতোৎসারিত প্রকাশ (এটি শিখা গুহর রচনার ওপর ভিত্তি করে গেজা বেথলেনফালভি তার 'হাঙ্গেরীয় বিদ্যাচর্চা আর সাহিত্যে ভারত' নামে বই-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীতে কী রকম সাড়া জাগিয়ে দিলেন তার প্রমাণ তাঁর লেখা এবং তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন নিবন্ধের সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে পাওয়া যায়। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগগুলির স্থায়িত্বের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১৯২৯-এ জায়তি ভারতে এলেন তাঁর হুণ-হাঙ্গেরীর সম্বন্ধগত মতবাদ সংক্রান্ত উপাদানাদি সংগ্রহ করতে এবং তাঁর নৃতত্বগত প্রমাণ খুঁজতে। তাঁর ভারত সফরের সবচেয়ে বড় দিক হলো ভারত আর হাঙ্গেরীর শিক্ষাবিদ ও শিল্পীদের মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতা স্থাপন করা যা এই সময়ে আর্থনীতিক সঙ্কটের ফলে হাঙ্গেরীর বিজ্ঞান আকাদেমী বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি করে উঠতে পারছিল না। তিনি বেশ কিছু ছবি আর স্কেচ এঁকেছিলেন ভারতীয় নরনারী এবং নিসর্গ-দৃশ্য নিয়ে। বুদাপেস্তের শিল্পবিষয়ক মিউজিয়ামে তার অনেকগুলি প্রদর্শিতও হয়।

অধ্যাপক গুইলা জারমানুস (১৮৮৪-১৯৭৯) ছিলেন ইসলামী বিদ্যায় এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালে আহ্বান জানান শান্তি-

নিকেতনে হায়দ্রাবাদের নিজামএর পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ইসলামী বিদ্যার প্রধান পদটি গ্রহণ করতে। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: জারমানুস শান্তিনিকেতনে বেশ কয়েক বছর ছিলেন এবং ইসলামী একদল ছাত্রকে বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন।' জারমানুস ভারতের নানা স্থান ভ্রমণের সুযোগও এইভাবে পেলেন। তিনি ভারতে তুর্কদের ওপরে বিশ্লেষণমূলক গবেষণার ওপরে জোর দিতেন এবং উৎস-উপাদান পাঠ করতে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। প্রতি বক্তৃতার পরই এইসব মূল উৎস পরীক্ষা করার জন্য তিনি পাঠচক্রের ব্যবস্থা করতেন। সাহিত্যিক এবং দার্শনিক গ্রন্থাদির অধ্যয়ন আর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেও পাঠচক্র আয়োজিত হতো। তাঁর গ্রন্থাগারটি বেশ বড় ছিল। তাতে ইসলাম-বিষয়ক প্রচলিত সব নির্দেশগ্রন্থই তিনি যোগাড় করেছিলেন। ছাত্রদের সবরকম ভালোর দিকে তাঁর নজর থাকতো। বহুবছর পরে ১৯৫৮-তে তিনি যখন আবার ভারতে আসেন তখন তিনি জুম্মা মসজিদে প্রার্থনায় যোগ দেন এবং ডাঃ জাকির হোসেনের অতিথি হন। তিনি সেবার বোম্বাই, আগ্রা, আলিগড়, লাখনৌ, কলকাতা এবং হায়দ্রাবাদে বক্তৃতা দেন। তাঁর নানান কাজ ভারতে প্রকাশিত হয়েছে: বিশ্বভারতী বুলেটিন এবং বিশ্ব-ভারতী কোয়ার্টারলিতে ইসলামীয় গবেষণা, ইসলামে নব আন্দোলন, ইসলামে আধুনিক আন্দোলন প্রভৃতি; তাছাড়া, ডাঃ জাকির হোসেন স্মারক গ্রন্থটিতে (দিল্লী ১৯৬৭) আছে আরবী কবি ও সমালোচক-বিষয়ে স্মৃতিচারণ।

শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী রোজা হাজনোস্‌জি। তিনি 'বেঙ্গলী তুজ' বা বাঙ্গালী আগুন নামে একটি ছোট উপন্যাস লেখেন। বইটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়েছিল। এতে এক গৃহবধূর চোখে প্রতিভাত বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন চিত্রিত। শানিকেতনের তখনকার মানসিকতা এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়।

মিসেস এলিজাবেথ সাস ক্রনার এবং মিস এলিজাবেথ ক্রনার নামে

দুই মহিলা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৩০ সালে। শান্তিনিকেতনে তখন অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল রয়েছেন। তাঁদের এবং বেঙ্গল স্কুলের আরো অনেক শিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই মা আর মেয়ের আলাপ করিয়ে দেন। শান্তিনিকেতনে তাঁরা দুবছর ছিলেন এবং কয়েকটি চমৎকার রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি আঁকেন। পরে তাঁরা সারা ভারত এবং নানা বৌদ্ধ দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁদের সঙ্গে গান্ধী, নেহেরু পরিবার এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের পরিচয় ঘটে। এলিজাবেথ ব্রুনার এখনো দিল্লীতেই আছেন। তাঁদের ছবিগুলি আজ হাঙ্গেরীর সংস্কৃতি ভাণ্ডারের অন্তর্গত এবং বিস্তৃত খ্যাতির অধিকারী। এ সম্বন্ধে দুটি মত তুলে দিই: "শ্রীযুক্ত সাম ব্রুনার এবং তাঁর মেয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে পরিচয় আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। কৃষক জীবন নিয়ে আঁকা তাঁদের কিছু ছবি তাঁরা আমায় দেখিয়েছেন। আমি অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু একেবারে গ্রামের লোকেদের রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা যে গভীর বাস্তবতার ব্যবহার করেছেন তা চোখ এড়ায় না। আমার মনে বিশেষ ভাবে ছাপ ফেলেছে ভারত এবং তার জনগণের প্রতি এঁদের ভালবাসা।" (মো. ক. গান্ধী, ব্যাঙ্গালোর ১৯৩১)। অন্যটি: "শ্রীযুক্তা ও কুমারী ব্রুনারের শিল্প-প্রতিভা উচ্চ পর্যায়ের। তাঁদের তুলি যে আমাদের নিসর্গদৃশ্য এবং ভারতের মানবপ্রকৃতির প্রাণ এবং বর্ণকে প্রকৃতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন ১৯৩৫)। ১৯৮১ সালের ৩০শে অক্টোবর থেকে ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত বুদাপেস্তে তাঁদের বেশ কিছু ভালো ছবির প্রদর্শনী হয় হাঙ্গেরীর প্রেসবিটেরিয়ন চার্চের রাদে কলেজে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশপ কারোলি টোথ এবং ভূমিকা করেন হাঙ্গেরীয় জাতীয় গ্যালেরির অবসরপ্রাপ্ত ডিরেকটর ডাঃ গাবোর ও পোগানি।

জনৈক ভারতীয়কে বিবাহ করে শান্তিনিকেতনে বাস করা কালে

সেখানকার গ্রন্থাগারে অনেকদিন কাজ করেছিলেন শ্রীমতী এটা ঘোষ। তিনি একবার হাঙ্গেরীতে এসে রবীন্দ্র-গবেষণার অনেক নির্দেশ গ্রন্থের সন্ধান দেন। গেজা গারদোনয়ী (১৮৬৩-১৯২২) নামে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের একগুচ্ছ গল্প এটা ঘোষ অনুবাদ করেন। তাঁর স্বামী রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারের কাছের লোক ছিলেন।

ডাঃ চার্লস ফাবরি (১৮৯৯-১৯৬৮) ছিলেন আরেক হাঙ্গেরীয় যিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন ভাস্কর্য, কলা-ইতিহাস এবং শিল্প-সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৩-এ বিশ্বভারতীতে তিনি শিল্পের ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

প্রাচ্যবিদ এরভিন বাকতে (১৮৯৪-১৯৬৩) রবীন্দ্রনাথের ওপর যা লেখেন তা ঐ বিষয়ে হাঙ্গেরীতে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য রচনা। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময় হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার মধ্যে কেবল একটি পোষ্টকার্ড হাঙ্গেরীয় সাধারণ গ্রন্থাগারে আছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিচিত হাঙ্গেরীয়দের মধ্যে একজনের সম্পর্কে উল্লেখ করতেই হয়। বুদাপেস্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের বলেন যে হাঙ্গেরীয় বেহালাবাদিকা ইয়েললি দ্য আরন্‌য়ী তাঁর বন্ধু-স্থানীয়া। রথীন্দ্রনাথের 'অন দা এজেস অব টাইম' গ্রন্থে এই বন্ধুত্বের কথা আছে। তিনি ১৯২০ সালের ৪ঠা অগাষ্টের ডাইরির ওপর ভিত্তি করে যা লিখেছেন তা এই : কিছুদিন আগে বাবার সঙ্গে রোটেন-ষ্টাইনের বাড়িতে দেখা হয় কুমারী আরান্‌য়ীর। রোটেন্‌ষ্টাইন দিলীপ রায়কে সে সন্ধ্যায় ভারতীয় গান গাইতে ডেকেছিলেন। বাবাও তাঁর নিজের কয়েকটি গান গাইলেন। আরান্‌য়ী তাতে এত মোহিত হন যে তিনি বাবাকে একটি পার্টিতে যেতে অনুরোধ জানালেন যেখানে তিনি নিজে বেহালা বাজাবেন। তিনি বললেন তাঁর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো বাবার সামনে বাজানো। বাবা সেখানে গেলেন এবং যখন ফিরলেন তখন তাঁর মন ও মুখ আনন্দে

ভরে গিয়েছে—আরান্‌য়ী তাঁকে এমনই অপূর্ব সুরের আস্বাদ দিয়েছেন। সেদিন তিনি যেমনটি বাজিয়েছিলেন তেমনটি পূর্বে কখনো বাজান নি। বাবা বললেন এই প্রথম তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীত পুরোপুরি বুঝলেন এবং তার রস পেলেন। মহিলাটি অসাধারণ শিল্পী। কিন্তু ভাল করে বাজাবার জন্য তাঁর অনুপ্রেরণার দরকার হয়। আর, সেই সন্ধ্যায় তিনি সত্যি সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইনি শুধু উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পীই নন, মানুষ হিসাবেও ইনি অপূর্ব সরল, মনখোলা শিশুর মতো এবং মনে হয় এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্তার অধিকারিণী। রোটেনষ্টাইন এবং বাবা—দুজনেই ওঁকে দেখেই মুগ্ধ। রোটেনষ্টাইন আরেক সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে আরান্‌য়ীকে বাজাতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমরা সবাই সেদিন ছিলাম। উনি বললেন যে উনি ক্লান্ত তাই ওঁর বোনের সঙ্গে দ্বৈত বাজনা বাজাবেন। দুজনেই চমৎকার বাজালেন, কিন্তু বাবার মতে সে বাজনা আগের সন্ধ্যার মত ঠিক হলো না। আরান্‌য়ীর বিয়ে হয়েছিল এক গ্রীকের সঙ্গে। নাম মিঃ ফাচিরি। ভারি ভাল লোক। বোন দুজন হাঙ্গেরীয় সঙ্গীতকার জোয়াকিমের ভাগ্নি। পরের সপ্তাহে আমরা ওঁদের বাড়ি গেলাম চা এর নেমন্তন্নে। বন্ধুত্ব হতে বেশী দেরী হলো না। বেশী লৌকিকতা করেন না; ওঁদের সঙ্গে যে একটা মানবিক সম্বন্ধে বাঁধা আছি—সেটা সহজেই বোধ হয়। অধ্যাপক টোভি-ও সেখানে ছিলেন। তিনি বাখ এবং হেইডন থেকে কিছু বাজালেন এবং পরে তার ব্যাখ্যা করে দিলেন। ওঁর মতে বাবার কিছু গান ওঁর কাছে আর সবাইকে বাদ দিয়ে হেইড্‌নের সাদৃশ্যই বহন করে। এর পরে ওঁরা সবাই মিলে (পিয়ানো, চেলো আর দু'টি বেহালায়) ব্রাহ্‌ম্‌সের একটি অতি সুন্দর রচনা বাজালেন। এই মহিলাদের সঙ্গে আলাপ হওয়াটা আমরা সকলেই খুব সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করলুম।"

শ্রীমতী আরান্‌য়ীর জন্ম বুদাপেস্তে। ১৮ বছর বয়সে তিনি

ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা হন। এই শতকের একজন দক্ষতম বেহালা শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। এক ইংরাজ সমালোচকের বক্তব্য হচ্ছে: "ওঁর শিল্পের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা মনকে সারাক্ষণ বিস্মিত রাখে। এই বিশুদ্ধতা শুধু স্বরপ্রয়োগেরই নয়, বাজাবার ষ্টাইলেও প্রকাশিত।" এক মার্কিনী সমালোচক-ও প্রায় একইভাবে লিখেছেন: "ইয়েললি দ্য আরান্যীর মধ্যে সবদিক থেকে এক অসাধারণ শিল্পীর সম্মুখীন হতে হয়।" হস্তিদন্তাভ গায়ের রং, মিশকালো চুল, ক্ষীণ আকারের এই মহিলা মুহূর্তের মধ্যে প্রমাণ করেন যে তিনি বেহালা শিল্পী হিসেবে অত্যুচ্চ শ্রেণীর, এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তাঁর বিজয়ক্ষেত্র সর্বদিকে উন্মুক্ত। মাধুর্য, সৌন্দর্য, সঙ্গীতশিল্পে অধিকার এবং দরদী মন ইত্যাদির দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ খুব কমই আছে।" (ডেভিড ইউএনের 'লিভিং মিউজিসিয়ান' নিউ-ইয়র্ক ১৯৪০, থেকে মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত)। রবীন্দ্রনাথ আর আরান্যীর মধ্যে দুই মহান আত্মার মিলন দেখা গিয়েছিল। এটা হাঙ্গেরীয়দের পক্ষে গৌরবের বিষয় যে তাঁদের দেশী এক বেহালাশিল্পী (ইনি ছিলেন বুদাপেস্ত সঙ্গীত আকাদেমীতে জেনো হুবে-র (১৮৫৮-১৯৩৭) ছাত্রী এবং যাঁর জন্যেই হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতকার বেলা বারতোক (১৮৮১-১৯৪৫) একটি প্রধান রচনায় হাত দিয়েছিলেন) রবীন্দ্র-নাথকে ইউরোপীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতে নিবিষ্ট করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ কালে হাঙ্গেরীর সঙ্গে বহির্জগতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। তার আর্থনীতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সুস্থতা লাভ করতে ১৯৪৫ সালের পরের কয়েকবছর লেগে যায়।

সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরী স্বাধীন ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনে দেরী করে নি। তার সুফল দেখা যায় ভারতের সঙ্গে হাঙ্গেরীয় বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিকাশে এবং হাঙ্গেরীতে ভারতীয় সাহিত্য প্রকাশনায়। ১৯৫৬-তে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি বালাতোন

ফুরর্দে স্থাপিত হয়। হাঙ্গেরীয় সংবাদপত্রে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনেক রচনা বের হয়—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৬১-তে তাঁর একটি ছোটগল্প সঞ্চয়নও বেশ সুচারুভাবে হাঙ্গেরীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।

১৯৬৬-তে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চবিংশতম বার্ষিকী হাঙ্গেরীর জনগন পালন করতে ভোলেন নি। হাঙ্গেরীর সামাজিক মেহনতী পার্টির মুখপত্র নেপস্‌জাবাদসাগ-এ একটি বন্ধুভাবাপন্ন প্রবন্ধ এই উপলক্ষে স্থান পায়।

কংগ্রেস দলের তৎকালীন সভাপতি কামরাজ নাদার ১৯৬৬-তে বালাতোনফুরর্দে যান। ১৯৬৮-তে হাঙ্গেরী সফরকালে রাষ্ট্রপতি জ়াকির হোসেন রবীন্দ্রনাথ রোপিত গাছটির পাশে আরেকটি চারা-গাছ রোপন করেন।

১৯৭২-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও হাঙ্গেরীতে এসে বালাতোন ফুরর্দে যান। একটি ছবিতে আছে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিজড়িত গাছটির একটি পাতা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধী ১৯৩১-এ শান্তিনিকেতনে এলিজাবেথ ব্রুনার এর আঁকা একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি হাঙ্গেরীর জাতীয় সংগ্রহশালাকে উপহার দেন।

১৯৬১ সাল থেকে হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্র রচনাবলীর অসংখ্য নতুন নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে এবং বিক্রীও হয়েছে। বুদাপেস্তের এওতো ভোস লোরান্দ বিশ্ববিদ্যালয়-এর সঙ্গে বই এবং অন্যান্য প্রকাশনার বিনিময় নিয়মিত চলছে। তাই ষাটের দশকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাঙলা রচনা উপহার পান।

বালাতোনফুরর্দে ১৯৭৮ সালে তিব্বতী এবং বৌদ্ধ গবেষণার এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে অধ্যাপক লোকেশ চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের রোপিত গাছটির পাশে আরেকটি চারাগাছ বসান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুবাদ ও সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ যে খুবই উঁচুদরের কবি ছিলেন তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। হাঙ্গেরী দেশটিও কবি এবং কাব্যরসিকদের দেশ। এখানকার কবিরা আজন্ম শিক্ষক। আবার কখনো কখনো দেশের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাঁরা জনমত গঠনে এবং সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করেন। অতএব কবিতা—সে দেশীয়ই হোক অথবা বিদেশীই হোক—হাঙ্গেরীয়দের কাছে পবিত্র বস্তু। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ যে গভীর এবং নিবিড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

হাঙ্গেরীতে কবিতার বই বিক্রি হয় খুব দ্রুত। বিদেশী সাহিত্যের সমাদরও যথেষ্ট। তার জন্য অষ্টাদশ শতক থেকেই কাব্যানুবাদে হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ কবিরা রত ছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যুক্ত ছিলেন না—বিশেষত কবিতার বেলায়। তাই হাঙ্গেরীয় অনুবাদে রবীন্দ্র কাব্য প্রথম দিকে যথেষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে তাঁর গদ্য রচনা—গদ্য বলেই হয়তো সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি।

আসলে সাহিত্যের অনুবাদে প্রধান সর্ত হলো যে ভাষা থেকে এবং যে ভাষাতে অনুবাদ করা হচ্ছে সেই দুটি ভাষাতেই অনুবাদকের কুশলী হওয়া। রবীন্দ্ররচনাবলীর হাঙ্গেরীয় অনুবাদে এই সাধারণ সর্তটি খাটে নি। কারণ কোন হাঙ্গেরীয়ই বাঙলা জানতেন না। হাঙ্গেরীর অনুবাদকেরা তাই তাঁর ইংরেজি বা জার্মান তর্জমার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। রবীন্দ্রনাথ যে অত্যুচ্চ মানের কবি ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর রচনা উপরোক্ত বিরাট বাধাকে অনেক পরিমাণে

অতিক্রম করতে পেরেছিল। হাঙ্গেরীতে তাঁর লেখা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অচিরেই এবং বিশের দশকে পুস্তক প্রকাশকরা যত পারেন তাঁর রচনা বার করতে লাগলেন, এবং উৎসাহ দিতে লাগলেন অনুবাদকদের, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে হাঙ্গেরীর পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

শুরুতে সব কিছুই বেশ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ছিল। গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ করলেন মিহালী বাবিৎস। ইনি বিংশ শতকে হাঙ্গেরীয় ভাষার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি। তাছাড়া কথা সাহিত্যিক, সাহিত্যবিষয়ক পাণ্ডিত্য এবং নৌগাত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশে তাঁর স্থান ছিল পুরোভাগে।

বাবিৎসের অনুবাদে গীতাঞ্জলির কবিতার সব স্তবক-ও ছিল না। কিন্তু তিনি রক্ষা করতে পেরেছিলেন কাব্যের মোহিনী শক্তি। তাঁর অনুবাদ বেরোল ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর বেরোনোর সামান্য পরে।

১৯১৪ সালে কিছু বাছাই করা রবীন্দ্র কাব্যের অনুবাদ করেন ফেরেনস্ কেলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ইংল্যাণ্ডের প্রতি শত্রুতার মনোভাবে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ এবং প্রকাশের কাজ বেশ কয়েক বছরের জন্য বন্ধ থাকে। ব্যাপারটা দুঃখের সন্দেহ নেই। কারণ, এর ফলে রবীন্দ্ররচনানুবাদের যে শুভারম্ভ হয়েছিল তাতে বাধা পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন যুদ্ধ শেষ হবার পর—একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পটভূমিকায়। তখন হাঙ্গেরী দুর্দিনের সম্মুখীন, অনেকেই প্রগতিতে আশা রাখতে পারছেন না; দেশজুড়ে উদগ্র জাতীয়তাবাদের হাওয়া বইছে। গীতাঞ্জলির সম্পূর্ণ অনুবাদ হয় এই পর্বে ১৯২০ সালে। অনুবাদক ছিলেন, জিসেততিরমায়। বইটি অসাধারণ সমাদর পেল। ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে এর আরো দুটি সংস্করণ হলো। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে উক্ত সাফল্য পাবার যোগ্যতা অনুবাদটির ছিল না।

গীতাঞ্জলির এবং দা গার্ডেনার-এর কিছু বাছাই করা কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন ভি. জোলতান ১৯২২ সালে। গীতাঞ্জলি যদিও ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পরিগনিত, তবুও বাঙলা ছন্দ এবং মিলের সৌন্দর্য এতে নেই। যেহেতু হাঙ্গেরীয়তে অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি থেকে তাই মূল রচনা সে অনুবাদে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ এইরকম নির্দিষ্ট অনুবাদেও কিছু কিছু রত্ন পাওয়া যায় যা কবির সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দেয়।

. চিত্রার অনুবাদ করেন দেজ্‌সো লেকি। যেটি বেরোয় ১৯২০-তে। এই প্রথম অনুবাদটিতেও জীবনদেবতা, অন্তর্যামী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কবিতাগুলি আছে কিন্তু তবুও সমসাময়িক কালের রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের মানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর নয়। ১৯২০-তে জোলতান বারতোস প্রথম দা গার্ডেনার বইটির সম্পূর্ণ তর্জমা করেন। বারতোস ছিলেন সবচেয়ে পরিশ্রমী রবীন্দ্রব্যাখ্যাকার। দা গার্ডেনার বইটি ছোট হলেও এর আকর্ষণে আরো তিনজন অনুবাদক এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে, লায়োস আপ্রিলির কাজ দুভার্গ্যক্রমে অসম্পূর্ণ; মার্গিত কোপাস্‌সির তর্জমা (১৯৭৯-তে প্রকাশিত) যথেষ্ট কাব্যগুণসম্পন্ন; আর পূর্বে যাঁর কথা উল্লেখ করেছি সেই ভি. জোলতানের গীতাঞ্জলির কিছু অংশের অনুবাদ নৈরাশ্যজনক।

Lovers's Gift জোলতান বারতোস হাঙ্গেরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন ১৯২ সালে। অনুবাদটি যে খুব ভাল হয়েছিল তেমন মনে করার কারণ নেই, কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উৎসাহ এত প্রবল যে কিছুকালের জন্য ভালোমন্দ বিচার করার প্রবণতাকে এই বই-এর ব্যাপারে চেপে রাখা হয়েছিল। ঐ একই মানের অনুবাদে জোলতান বারতোস ১৯২২-এ হাঙ্গেরীয় পাঠকদের সামনে আনলেন Fruit Gathering। ঐ বছরেই আরে দুটি ছোট বই বেরোল: Stray Birds—অনুবাদক জোলতান বারতোস, এবং একটি কাব্যসংকলন—অনুবাদক মার্তন সারমে। তর্জমা বিশেষ ভাল হয় নি। বিশেষত

Stray-Birds কবিতাগুলির ধ্বনি নাকি কোন দুর্লভ ধাতুনির্মিত ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে তুলনীয়—ভাষান্তর তো রীতিমত শোচনীয়। অথচ তা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রানুরাগীদের সংখ্যা বেড়েই চলল। বৈষ্ণব এবং বাউলদের মরমীয়াবাদের ভাবে রচিত Crossing-এর কাব্যিক শক্তিহীন এক ভাষান্তর জোলতান বারতোস করলেন ১৯২২-এ। ক্রেসেণ্ট মুন্ আকৃষ্ট করেছিল একাধিক হাঙ্গেরীর অনুবাদককে। প্রথম অনুবাদ করেন জোলতান বারতোস এবং বেনো সৃজোলদোস ১৯২৪-এ। শেষোক্ত ব্যক্তিটির গ্রীক থেকে তর্জমার ক্ষমতা এবং অভ্যাস ছিল। কিন্তু ওঁদের যৌথ কাজ হয়েছিল মাঝারি শ্রেণীর। বরঞ্চ অনেক ভাল কাজ করেছিলেন মার্গিত কোপাসসি। তাঁর অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের অনেক কাছাকাছি, তাঁর ভাষা আধুনিক, গতিশীল এবং বর্ণময়।

রবীন্দ্রনাথের সবকটি নাটকের বিষয়ে নয়, কেবল যে-কটি হাঙ্গেরীতে অনূদিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে এবার কিছু বলি। এই নাটকগুলি হাঙ্গেরীতে পঠিত হয়েছে, কিন্তু কখনো অভিনীত হয়নি। তার কারণ নারাভানের ভাষায় বলতে গেলে হচ্ছে এই: "যে সব চরিত্ররা নাটকের ঘটনা উন্মোচনে সহায়ক নয় তাদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে ভীড় জমানোর জন্য, মানবিক ব্যাপারে হঠাৎ প্রকৃতির প্রবেশ ঘটানোর জন্য, গল্পের প্রবাহকে যুক্তিসম্মত ভাবে এগোতে না দেওয়ার জন্য, নাটকের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অনেক চরিত্রের মুখ দিয়ে অতীন্দ্রিয় কথা বলানোর জন্য, এবং প্রতীকবাদের বাড়াবাড়ির জন্য—অনেক সমালোচকই রবীন্দ্রনাথকে তিরস্কার করেছেন।" তাঁর যে-দুটি নাটক হাঙ্গেরীয়তে অনূদিত তারাও ঐ প্রতীকি পর্য্যায়ের। ও ওয়াইণ্ডনার নানান ভাষা থেকে নির্ভরযোগ্য অনুবাদক হিসেবে গণ্য ছিলেন। তিনি রাজা নাটকের অনুবাদ করেন ১৯৩০-সালে। ভারতে এ ধরনের নাটক প্রচলিত ছিল। যেমন কৃষ্ণ মিশ্রের রূপকনাট্য প্রবোধচন্দ্রোদয়। এতে চরিত্রগুলি একেকটি দার্শনিক ধারণার প্রতিনিধি। ইউরোপীয়

এবং হাঙ্গেরীয় পাঠকদের কাছে এমন মরমীয়াবাদ মিশ্রিত এবং কিছুটা দুর্বোধ্য দার্শনিকতা আচ্ছন্ন নাটক একেবারে নতুন লেগেছিল। অবশ্য এই নাটক সম্বন্ধে কিছু নঙর্থক প্রতিক্রিয়া বা কোনরকমেরই সমসাময়িক সমালোচনা চোখে পড়ে নি। তবে হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের তৎকালিক ভাবমূর্তির সঙ্গে নাটকটি খাপ খেয়ে গিয়েছিল। অনেক হাঙ্গেরীয় রবীন্দ্রভক্ত প্রচলিত মরমীয়াবাদের এক অভিব্যক্তি বলেই এটিকে ধরে নেন। এই মরমীয়াবাদ কথাটি তখন এবং এখনো রবীন্দ্রনাথের আসল রূপটিকে অনেকাংশে ম্লান করে। যে কোন প্রাচ্যসুলভ ধারণার সঙ্গে মরমীয়াবাদকে হঠাৎ জুড়ে দেওয়াটা খুবই ভুল। এর জন্যেই রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিতে ভাঁটা আসে এবং একদল সমালোচক রবীন্দ্র-বিরোধী মন্তব্য প্রকাশে উৎসাহ পান। একটি ভাল ভূমিকা ছাড়াই এই নাটক প্রকাশ করা ঠিক হয় নি। কারণ হাঙ্গেরীয় পাঠক যেমন গ্রীসের নয়া-প্লাতোনিজ্‌সের মাইক্রোকসমস বা ম্যাক্রোকসমস-এর ধারণা করতে অপারগ তেমনি উপনিষদ-বেদান্তের আত্ম-ব্রহ্ম বুঝতেও অক্ষম।

ডাকঘর ১৯২২-এ বেরোল। অনুবাদক, জোলতান বারতোস। রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটিকে পদ্যকাব্যে নাটক বলে মনে করতেন (দ্রঃ ডাঃ সুকুমার সেন)। এর প্রতীকী প্লটটি কী ভাবে ব্যাখ্যাত হবে সে-সম্বন্ধে নানা সমালোচকের নানা মত। সুকুমার সেনের ধারণা হচ্ছে ডাকঘরে একটি আত্মার আধ্যাত্মিক অন্বেষণ রূপায়িত। নারাভানে বলেন যে মানব আত্মার মুক্তি-স্পৃহা এই নাটকের মূল প্রতীক। ইয়েটস নাটকটিকে অসাধারণ মনে করেছিলেন। তাঁর মতে: "এই ছোট নাটকটি ষ্টেজে দেখলে মনে হবে যে এটি নিখুঁত ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। আর, ঠিকমত দর্শকের মনে এটি নিয়ে আসে শান্ত এবং শান্তির ভাবের আমেজ।" ডাকঘর লণ্ডন, প্যারিস, প্রাগ, রিও দি জেনিরোতে মঞ্চস্থ হয়েছে। সমালোচক এডোয়ার্ড টম্পসন লিখেছেন এর "ভাষা স্বাভাবিকতার উৎসকে অনতিক্রমনীয়"

এবং নাটকটি এর সীমার মধ্যে প্রায় নিখুঁত শিল্পের মানে পৌঁছেছে। কালিদাস এবং শেকসপিয়ার যা পারেননি তা ডাকঘরে সম্ভব হয়েছে—একটি বালককে নাটকে দেখা গেল যে বোকাও নয়, আবার নিজেকে জাহিরও করে না।" ডাকঘর কিন্তু বুদাপেস্তে খুব সাড়া জাগায় নি। অনেকে নাটকটি পড়েছিলেন, কিন্তু কেউ অভিনয় করেন নি।

নৌকাডুবি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে হাঙ্গেরীয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অনুবাদ করলেন জোলতান বারতোস ১৯২২-এ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৫)। এটি বেশ জনপ্রিয় হলো। কৃষ্ণ কৃপালনী অবশ্য লিখেছেন : সহুরে এবং অতি-সংস্কৃতিবান সমালোচকরা উপন্যাসটির প্রতি প্রীত নন।" তবে তিনি ঐ সঙ্গে তুলে দিয়েছেন চেক অধ্যাপক লেসনীর মত, "এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসগুলির অন্যতম।" সামাজিক আর ব্যক্তিগত সমস্যাদির মিশ্রণ হাঙ্গেরীর সাহিত্য পাঠকের চিরকালই ভাল লাগে। তাই নৌকাডুবির কাহিনী তাদের আকৃষ্ট করে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হলো।

১৯২৪-এ ফেরেনস কেলেন ভাষান্তর করলেন ঘরে বাইরের। হাঙ্গেরীয়তে তার নাম হলো বিমলা। এতে বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমিকায় চিত্রিত হলো বিমলার প্রণয় সমস্যা—স্বামী নিখিলেশ এবং তার বন্ধু সন্দীপকে ঘিরে। রাজনীতিতে নিখিলেশ মডারেট কিন্তু সন্দীপ চরমপন্থী। বিমলা অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার স্বামী এবং স্বামীর মতামতকেই গ্রহণ করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে হাঙ্গেরীতে তখন নতুন নতুন ঘটনাধারা দেখা দিয়েছে। সেই সময়ে ঘরে বাইরে উপন্যাসটি এবং এতে উত্থাপিত সব প্রশ্নাদি হাঙ্গেরীর পাঠকদের মনকে টেনেছিল আর সেই সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে সহানুভূতির উদ্রেক করেছিল। সম্ভবত এটাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সুকুমার সেন এটীকে "আধুনিক মহাভারত" বলে অভিহিত করেছেন।" ভারতীয়

উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঘরে বাইরে-র স্থান রুশদের কাছে লেভ তলস্তই-এর যুদ্ধ আর শান্তি-র মত। "অন্য কোন বই-এ অসংখ্য বিরোধিতা পূর্ণ জটীল ভারতীয় জীবনের কিম্বা পুনরুজ্জীবিত হিন্দুত্ববোধজাত এবং বিশ্বমানবতাবাদের প্রতি ধাবিত ভারতীয় জাতীয়তাদের চরিত্রের এমন সুদক্ষ বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে না"—কৃষ্ণ কৃপালনী। যেমন বিষয়বস্তুর দিক থেকে তেমনি রচনারীতিতে এই উপন্যাসে আধুনিক বাস্তববাদী কথাসাহিত্যের সব গুণই পাওয়া যাবে। দুঃখের বিষয় এরভিন বাকতে ছাড়া হাঙ্গেরীতে বিশেষ কেউ এইসব গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। এমন কি আনতাল স.জের্বের মতো পণ্ডিত সমালোচকের-ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গদ্য রচনার সঙ্গে ঘরে বাইরের পার্থক্য চোখে পড়ে নি। এমন কি আজও ঘরে বাইরে নতুন করে অনুদিত হলে হাঙ্গেরীতে সেটি খুবই সমাদৃত হবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের খ্যাতি-ও হাঙ্গেরীতে কম ছিল না। ১৯২২-এ তাঁর দুটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। এ-দুটির মধ্যে একটিতে ছিল অতিপ্রাকৃত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ক্ষুধিত পাষাণ। তার অনুবাদ করেছিলেন জোলতান বারতোস। আর যেটিতে শেষের রাত্রি এবং অন্যান্য গল্পগুলি ছিল তার তর্জমা ছিল এম. সারমে-র।

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলির মধ্যে কোন একটিই হাঙ্গেরীতে পৌঁছেছিল। ১৯২২-এ জি, হাসোনগার্ডি অনুবাদ করেন জীবনস্মৃতি-র। এতে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বাল্য এবং যৌবনকাল বর্ণিত এবং তার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের ধারাটির একটি আন্তর পরিচয় পাওয়া যায়। বইটি-রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরীয় পাঠকদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়—বিশেষত এই জন্যে যে তারা নিজেদের প্রিয় কবি বা কথাসাহিত্যিকদের খুব কাছ থেকে চিনতে অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-কথা আরো বেশী করে খাটে কারণ তাঁর জীবনকে দেখা হয়েছিল এক পশ্চিম প্রভাবিত হিন্দু অভিজাত অথচ বহু সমাজ এবং ধর্ম নেতায় পূর্ণ

বিরাট পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে—লেভ তলস্তই এর সঙ্গে মিলিয়ে। তখন হাঙ্গেরীর সমাজের যাঁরা প্রধান এবং শিক্ষিত ছিলেন তাঁদের অনেকই ছিলেন আগেকার দিনের বিশেষ ক্ষমতাভোগী অভিজাতশ্রেণী সম্ভূত। তাছাড়া, বেশি কিছু সংখ্যক ছিলেন বিদেশী (জার্মান বা ইহুদী) বুর্জোয়াশ্রেণী উদ্ভূত। তাঁদের চেষ্টা ছিল সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের সংশ্লেষণ ঘটানো। রবীন্দ্রনাথের বংশে তাঁরা উক্ত প্রক্রিয়াকে আবিষ্কার করেন এবং তিনি যাতে হাঙ্গেরীতে স্বীকৃতিলাভ করেন তার "জামিনদার" হয়ে দাঁড়ান। এখানে আমি আবারও মনে করিয়ে দেব জোলতানের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক লেখাটির কথা যার সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে একবার লিখেছি। ফলে হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথ যে অভ্যর্থনা পেলেন তা ঠিক অন্যান্য দেশের মতো নয়। আমার বক্তব্যের সমর্থনে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ফরাসী লেখক এবং রবীন্দ্র অনুবাদক আঁদ্রে জিদ ১৯১৮ সালের ১৭ই জুন তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়লাম। এই ভারতীয় প্রাচ্যবাদীকে নিয়ে আমার পোষাবে না'। কিন্তু হাঙ্গেরীতে এরভিন বাকতে কেবল এই লিখলেন যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কুসুমাস্তির্ণ ছিল না।

এবার কয়েকজন রবীন্দ্ররচনাবলীর হাঙ্গেরীয় তর্জমাদারদের সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ খুব উঁচুদরের কবি অনুবাদক, অনেকে ছিলেন নির্ভরযোগ্য কিন্তু অনুবাদক হিসেবে তেমন গুণী নন, আবার কয়েকজন ছিলেন নিতান্ত পদ্য লিখিয়ে।

অনুবাদ জিনিসটা হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ কবি এবং কথাসাহিত্যিকদের সর্বদাই আকৃষ্ট করেছে। তার কারণ হচ্ছে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা বা রূপশৈলীর খোঁজে তাঁরা সর্বদাই বিদেশী সাহিত্যের দিকে নজর রাখতেন। হাঙ্গেরীয় কবিদের আরেকটা সুবিধে আছে! হাঙ্গেরীয় ভাষায় বাক্যের মধ্যে শব্দের স্থান পর্যায়ে কোন কড়াকড়ি নেই; শব্দ নির্মানেও বড় একটা নিয়ম মানতে হয় না; শব্দ নিয়ে খেলা

করার অবকাশ যথেষ্ট; এবং শব্দালঙ্কারের সমৃদ্ধি খুবই বেশী। বিদেশী কাব্য থেকে হাঙ্গেরীয় অনুবাদ অত্যুচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল সংস্কৃতকে ঘিরে—মহাভারত, রামায়ণ কিম্বা কালিদাস, অমরু, ভর্তৃহরি, জয়দেব প্রভৃতিদের কাব্য ভাষান্তরের ক্ষেত্রে। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য তর্জমার বেলায় তেমন সৌভাগ্য ঘটে নি। বাঙালা, উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা থেকে সরাসরি হাঙ্গেরীয়তে অনুবাদ করবার মতো ভাষাবিদ অনেক দিন পর্যন্ত হাঙ্গেরীতে দেখা দেন নি। এই সম্প্রতি কেবল তামিল এবং হিন্দী মূল থেকে কৃত অনুবাদ হাঙ্গেরীতে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরীয় অনুবাদক তার নিজের করা অথবা তাঁর জানা অন্যদের করা রবীন্দ্র-কাব্যের ইংরেজি তর্জমার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই সযত্নকৃত জার্মান এবং রুশ অনুবাদ (এই দুই ভাষায় মূল বাঙলা থেকে সরাসরি ভাষান্তর করা হয়েছে) হাঙ্গেরীয় অনুবাদকদের খুবই সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্য তর্জমায় যাঁরা হাত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কবি। যেমন, লায়োস আপ্রিলি (১৮৮৭—১৯৮১)। এই কবি নিখুঁৎ রূপের এবং চিরায়ত সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন—ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। তিনি 'দা মার্কেনার' ছাড়াও রুশ এবং জার্মান কবিতার বহুরত্ন হাঙ্গেরীয়তে অনুবাদ করে হাঙ্গেরীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। মিহালি বাবিৎস আরেকজন। তিনি নিজে ছিলেন চিন্তাশীল কবি, মার্জিত কাব্যরূপ প্রয়াসী এবং কাব্যকলাবিশেষজ্ঞ হিসেবে ল্যাটিন এবং হাঙ্গেরীয় ভাষার অধ্যাপক। তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম হাঙ্গেরীয় অনুবাদক এবং পরে দেখব তাঁর প্রথম সমালোচক-ও। যদিও তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি কিছুটা আভিজাত্য মিশ্রিত ছিল, তবুও সমকালীন সাহিত্যের তিনি সমজদার ছিলেন। তা নয়তো তিনি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের হাঙ্গেরীয় সাহিত্যজগতের প্রধান হিসেবে পরিগণিত হতেন না।

সোভিয়েত বিপ্লবের পরেই ১৯১৯-এ তিনি বুদাপেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেও তিনি তৎকালিন "শ্বেত—ত্রাসের" শিকার হন। ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়, জার্মান, ফরাসী এবং ইংরেজি থেকে তিনি অজস্র অনুবাদ করেছেন অননুকরণীয় ভাষায়। তাঁর নিজের গদ্য এবং কাব্য রচনা আর ঐ সমস্ত অনুবাদ একসঙ্গে মিলে হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের আঙ্গিনায় তাঁকে এক উচ্চ আসনে বসিয়েছে।

সান্দোর ওয়েত্তর (১৯১৩) বর্তমান হাঙ্গেরীর কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি অনুবাদকও। সুদক্ষ রূপকার এবং ভাষার জাদুকর হিসেবে তাঁর নাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি ভারতে গিয়েছিলেন বমগার্টের পুরস্কারের টাকায়। এই বার্ষিক পুরস্কারদাতা বমগার্টেন ফাউণ্ডেশনের অন্যতম কর্তা ছিলেন মিহালি বাবিৎস। সান্দোর ওয়েওর সম্বন্ধে এক সাম্প্রতিক সমালোচক লিখেছেন: "প্রাচ্যের দর্শন এবং আদিম পুরাণকাহিনীকে যে সব হাঙ্গেরীর কবি সর্বপ্রথমে ব্যবহার করতে সুরু করেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওয়েওর রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র কবিতা তর্জমা করেন এবং তাতেও তিনি মূল বাঙলার কথায় কথায় অনুবাদ ইত্যাদির কোন সাহায্য তিনি পান নি। যেহেতু এই রকম সাহায্য তিনি হাঙ্গেরীর সংস্কৃতবিদদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাই তাঁর গীত-গোবিন্দ কিম্বা অমরু, ভর্তৃহরি এবং কালিদাসের কাব্যের অনুবাদ এত অসাধারণ সুন্দর হয়েছে।

সান্দোর সুরি (১৯৩০) ওয়েওর মতোই একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা হাঙ্গেরীর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। অথচ তাঁর ও ছন্দ আর মিলের আঙ্গিকের ওপরে ছিল প্রচুর দখল এবং আধুনিক কবিদের মধ্যে খুবই গভীর ভাবে অনুধাবন যোগ্য।

রবীন্দ্ররচনা অনুবাদকদের আরেকটি দলের মধ্যে আছেন নিম্ন লিখিতরা:—

লাস্‌জ্‌লো বালাসসি একজন কবি এবং বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁর কবিতা এবং অনুবাদ নানান পত্রপত্রিকাতে প্রায়ই দেখা যায়।

সারা কারিগ সম্পাদনা এবং অনুবাদ উভয়েই সিদ্ধহস্ত। নানান জাতির কাহিনী নামে একটি সিরিজের ভার তাঁর উপর ছিল অনেক দিন ধরে। এই সিরিজে বেশ কিছু ভারতীয় রূপকথা অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত চমৎকার সঞ্চয়নটির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশ তিনি অনুবাদ করেন ইরেজি এবং এবং রুশ ভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলীর ওপর নির্ভর করে।

মার্গিত কোপাসসির কৃতিত্ব লক্ষিত হয় 'দা গার্ডেনার' আর 'দা ক্রিসেণ্ট মুন' এর নতুন ভাষান্তরে। তাছাড়া তিনি আরেকটি রবীন্দ্র কাব্যগুচ্ছ ও অনুবাদ করেছেন আজ, উতোলজো ভাজার নামে।

ওডোন ওয়াইল্ডনার (১৯৭৪—১৯৪৪) খুবই চমৎকার অনুবাদ করতে পারতেন জার্মান সাহিত্য থেকে। তিনি গ্যেটে এবং নিটশে-র ওপর প্রচুর পড়াশুনো করেছিলেন। তাছাড়া বুদাপেস্ত সহরের ইতিহাসে তিনি ছিলেন একজন বিশারদ। ওদিকে আবার তিনি বুদাপেস্ত প্রকাশনে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীও ছিলেন। হাঙ্গেরীর জাতীয় প্রকাশন এবং পুস্তকবিক্রেতাদের সংস্থার অধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন বহু বছর ধরে। রাজা নাটকের তর্জম তিনিই করেন।

ভিলমোস জোলতান (১৯৬৯—১৯২৯) ছিলেন একজন পণ্ডিত ইতিহাসবিদ এবং পরে হন সাংবাদিক। বিচিত্র অনুবাদে তাঁর হাত খুলত—বিশেষত ইংরেজি, জার্মান এবং ইটালিয় থেকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে, বিশেষত কবিতার বেলায়, তাঁর শিল্পবোধ ততটা প্রকাশ পায় নি।

জোলতান বারতোস নানান দিকেই একটু একটু এগিয়েছিলেন। অনুবাদের কাজ তিনি করতেন যান্ত্রিকভাবে। অবশ্য তিনি প্রকা-

শকদের অনেক টাকা উপায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এইসব প্রকাশকরা রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরীতে ক্রমবর্ধমান খ্যাতির সুযোগ নিতে পা বাড়িয়ে ছিল।

এই দলে জুটে গিয়েছিলেন জি. হাসোনগার্দি, এস. কেলেন, ডি, লেকি এবং জি. সুজেনতিরমেয় প্রমুখেরা। কিন্তু এঁদের কাজের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্ত স্বল্প। সাহিত্যকর্ম হিসেবে এঁদের কোন কাজই আজ কেউ মনে রাখে নি।

এই সম্পর্কে কোন বিবরণই সম্পূর্ণ হবে না যদি না সেইসব প্রকাশকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি যাঁরা রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করে যেমন আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন তেমনি আবার প্রচুর মুনাফাও করেছিলেন।

১৮৬৮ সালে স্থাপিত এথিনিয়াম কোম্পানী ছিল হাঙ্গেরীর এক প্রধান প্রকাশন। এখান থেকে বার করা হতো 'আজ এস্ত' এবং 'পেস্তি নাপোলো' নামে কাগজ দুটি—যাতে রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরী সফরের কার্যসূচী ছাপা হয়। এই কাগজ দুটিতে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেকার সময়ে প্রগতিশীল হাঙ্গেরীয় লেখকদের এবং বিদেশের বড় বড় লোকেদের জন্য প্রচুর জায়গা থাকত।

জিনিয়াস্‌জ স্থাপিত হয় ১৯২০-তে। দেশী বিদেশী বিখ্যাত সব লেখকদের নিয়ে একটি স্মরণীয় সিরিজ এবং সাধারণ লোকের জন্য বিজ্ঞানের বই প্রকাশের জন্য এই সংস্থার বেশ নাম হয়েছিল।

লেগার্ডি কোম্পানী গড়ে উঠেছিল ১৮৫৮ সালে। পেস্তি হিরলাপ নামে যে পত্রিকার কথা অনেকবারই উঠেছে, তা বেরোত এখান থেকেই।

রেভাই প্রকাশালয় (স্থাপিত ১৮৮০) হাঙ্গেরীতে পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ এবং সর্বোত্তমদের মধ্যে অন্যতম ছিল। এখান থেকে বেরোত সমস্ত রকম চিরায়ত সাহিত্য, বিশ্বকোষ প্রভৃতি এবং মোর জোকাই-র সমস্ত রচনা।

এইসব বড় বড় প্রকাশালয়ের নিজস্ব ছাপাখানা থেকে প্রকাশনার চমৎকার সব নমুনা বেরোত। তাতে লক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে ছাপার আধুনিকতম প্রযুক্তির কুশলী প্রয়োগ।

প্যানথিয়ন করপোরেশন রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রধান প্রকাশক ছিল। এখান থেকে তাঁর সাত খণ্ডে রচনা বেরোয়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকাশকদের তুলনায় এই সংস্থা ছিল অনেক ছোট। সম্ভবত সেই জন্যেই এঁরা জোলতান বারতোসের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদককে কাজ দিতেন। হাঙ্গেরীয়তে প্যানথিয়ন সিরিজে রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রচ্ছদ এবং ছাপা বেশ সুশোভন ছিল। তাদের আকৃতি ছিল যাকে বলে পকেট সাইজের। বাঁধাই শক্ত। মলাটে লাল জমির ওপরে লতা-পাতার সুন্দর নক্সা।

হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রকাশক ছিলেন—সাসেলারি হেলার অ্যাণ্ড ফিশার (এঁরা আসলে ভিয়েনার) প্রভৃতি ছোট ছোট সংস্থা। এরা বেশি দিন চলেওনি।

হাঙ্গেরীর জনশিক্ষার জাতীয় পরিষদ এবং হাঙ্গেরীয় থিওসোফিকাল সোসাইটি প্রত্যেকেই কবির একটি করে বই ছাপান। এইসব বই-এর মুদ্রণ সংখ্যা সব সময় এক রকম হয়নি। কয়েকটি ছাপা হয়েছে কয়েক শ'র মত, আবার কিছু কিছু হাজার-দু-হাজারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপ প্রকাশালয় এবং মোরা প্রকাশালয় আবার কয়েক খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী বার করেন। এই সময় কিন্তু মুদ্রণ সংখ্যা এবং মুদ্রণ সৌষ্ঠব বাড়ে অনেক পরিমাণে। 'দা গার্ডেনার' আর 'দা ক্রিসেন্ট মুন'-এর একেকটি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল দশ হাজার করে। যে-দেশের লোকসংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ সেখানে ঐ পরিমাণ ছাপা যে খুবই বৃহদাকারের তা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের হাঙ্গেরীয় সমালোচকদের কথায় এবার আসা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে প্রথম থেকেই বেশ কয়েকজন ছিলেন প্রখ্যাত

সাহিত্যিক বা সাহিত্য-ইতিহাসবিদ। এরা যা বলবার সোজাসুজি বলেছেন, কোন ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে যান নি।

প্রথমেই যাঁর বিষয়ে বলতে হয় তিনি মিহালি বাবিৎস—কবি, কথাসাহিত্যিক এবং সম্পাদক। ইনি রবীন্দ্রনাথের ওপরে সর্বপ্রথম লেখেন বিখ্যাত সাহিত্যপত্র নৌগাৎ-এ ১৯১৩ সালে কবির নোবেল পুরস্কারলাভের প্রসঙ্গে। এই লেখা আংশিকভাবে পুনঃপ্রকাশিত হয় নাগিভিলাগ-এ ১৯৬৬তে। বাবিৎস লেখেন: এ বছরের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার-জয়ীকে ইয়েটস (যে বইটির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তার ভূমিকাও তিনি লিখেছেন) তুলনা করেছেন সেণ্ট ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে। সত্যিই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল পাওয়া এমন একমাত্র ইউরোপীয় হচ্ছেন ক্যানটিকো ডেল ক্রিয়েচার-এর কবি। অন্য সব সাধুসন্তদের সঙ্গে এঁদের উভয়েরই একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে এঁরা কখনোই পৃথিবীর সৌন্দর্যের দিক থেকে নিজেদের মুখ ফেরান নি; এই সমস্ত সৌন্দর্য তাঁরা অবলোকন করেছেন মুগ্ধ চোখে এবং ঈশ্বর যে এমন বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তাঁরা ঈশ্বরের জয়গান করছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুর মতো সরল মন নিয়ে সঞ্চরণ করেছেন, চতুর্দিকে আঁখি মেলেছেন নন্দিতচিত্তে গান গাইছেন ভারতের মাঠে ঘাটে, অপরিচিত নদীর তীরে, মাথাতোলা ঘাসের মধ্যে ঠিক যেমন পোভারেল্লা বেড়িয়ে বেড়াতেন আমব্রিয়ার ফুলের গন্ধমদির প্রান্তরে প্রান্তরে। পাখি, ফুল, গাছপালা রবীন্দ্রনাথের ঠিক তেমনি প্রিয় যেমন তারা ছিল শিশুমনা পাখির-ভাষা-জানা সেণ্ট ফ্রান্সিসের।"

বাবিৎসের উপরোক্ত বক্তব্য যে খুবই হৃদয়গ্রাহী তা বোধহয় সবাই জানবেন। তিনি নিজেও তো কবি ছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধ তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। এই বোধ যে রবীন্দ্রমানসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সেটি অনেক সময়েই লক্ষ্য করা হয় না, কিম্বা ইচ্ছে করেই ভুল ভাবে ব্যাখ্যাত হয় যেমন

বিদেশী তেমনি ভারতীয় সমালোচকদের দ্বারা। এঁরা কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তিনি সামাজিক সমস্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। তাঁর নিজস্ব প্যানথিইজমকে অতি সরলভাবে দেখিয়ে তাঁকে নিতান্ত অসার আনন্দেব কবি বলে প্রমাণের চেষ্টা হয়। তাই, বাবিৎস-এর সিদ্ধান্ত এখনো আমাদের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং রবীন্দ্রনাথকে বিচারের মাপ কাঠি স্বরূপ। এ সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব সাহিত্যে খুব উচ্চস্থান দিয়েছে! এতে কোন সন্দেহ নেই যে বাবিৎস-এর সিদ্ধান্তই ঠিক—যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের চিরন্তন দিকটিকে অবজ্ঞা করে বিংশ শতকের কবিতার পটভূমিকায় তাকে যান্ত্রিকভাবে কাটা ছেঁড়া করে বিচার করেন, যাঁরা ভুলে যান যে বিংশ শতকের কবিতা কেবলই সমাজকেন্দ্রিক এবং তা অনেক সব রীতি আর ফ্যাশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অবক্ষয়ের দ্বারা পীড়িত, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বোঝেন নি। রবীন্দ্রনাথ মানব সভ্যতার পথে এক বিশেষ নির্দেশ চিহ্ন। তিনি মুক্ত এবং মানব অনুভূতির এক স্বচ্ছ উৎস। গীতাঞ্জলিতে কোথাও কোন কৃত্রিমতা নেই, কোন প্রচেষ্টার ছাপ নেই। বাবিৎস এই কথাই তাঁর আলোচনায় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

আলাদার কোপফ্লিন (১৮৭২-১৯৫০) ছিলেন নায়ুগাতে কর্মী। তিনি সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বিংশ শতকে হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছিলেন, এবং বাবিৎস কৃত গীতাঞ্জলি অনুবাদের একটি ছোট ভূমিকাও লেখেন। তাঁর বক্তব্য "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি এ বছর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, একজন হিন্দু কবি। তাঁকে পুরস্কার দেওয়ার ফলে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে, কেন না, ইউরোপীয় নন এমন লেখক এই প্রথম নোবেল পুরস্কার জয়ী হলেন। এই লেখকের নাম ইউরোপ মহাদেশে প্রায় অজানা, কিন্তু আজ যখন তিনি পরিচিতির উজ্জ্বল আলোতে ভাস্বর তখন সবাই বিস্মিতচিত্তে অনুভব করছেন যে নোবেল প্রাইজ কমিটি

একজন প্রথম শ্রেণীর কবিকে আবিষ্কার করেছেন যাঁর খ্যাতি নেহাৎ স্বল্পস্থায়ী হবে না। এই হিন্দু কবি তাঁর রচনা মূল বাঙলা থেকে নিজেই ছন্দোময় ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেন।"

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা বেশ কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে এরভিন বাকতে একবার মসিযুদ্ধে নাবেন। জোলতান এবং অন্যান্যদের অক্ষম অনুবাদ আর তার ওপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রভক্তির জোয়ার আনার বিরুদ্ধে বাকতে সোচ্চার হন। তিনি বলেন: "রবীন্দ্রনাথের ওপর আমাদের চোখে পড়ে বেশ চতুর এবং কৌশলী সমালোচনা বা মন্তব্যাদি, যার মধ্যে একদল তথাকথিত সৌন্দর্যবাদী আর্টের-জন্যই-আর্ট মতবাদ, কিম্বা নকল কবিয়ানা, কিম্বা আত্মবাদী উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য দিয়ে তাঁদের মতাদর্শগত শূন্যগর্ভতা আর ভারসাম্যহীনতা ঢেকে রাখার প্রয়াস পান। 'হয়তো এই রকম, হয়তো শেষ পর্যন্ত এই রকম নয়, দেখা যাক'—এই হচ্ছে এঁদের মূঢ় এবং ভীরু সমালোচনার কায়দা। হাড়সর্বস্ব গায়ের ওপর চামড়ার আস্তরণকে সাহিত্যিক উক্তি দিয়ে অলংকৃত করলে যা হয় এই সব সমালোচনা ঠিক সেই রকম।"

দেজ্‌সো কোস্‌জ্‌তোলানয়ী রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা এবং সামাজিক মত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন: "আমি উক্ত বিষয়াদি নিয়ে আজ আর ভাবি না। আমার মনোযোগ এখন আরো গাঢ়, আমার আনন্দ আরো গভীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাতৃভাষায় তাঁর একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। বাঙলাভাষার ধ্বনি কানের মধ্যে দিয়ে আমার মনের মধ্যে সাড়া তুলল। সংস্কৃত ভাষা—যাকে বলে দেবভাষা, তার থেকে উদ্ভূত যে প্রাকৃত, তারই দুহিতা বাঙলা ভাষা! এই ভাষার অকারান্ত-রূপটি অতি গীতিময়। এর গভীর ছন্দ, এর গলে যাওয়া নরম সুর একে মানবজাতির ঘুম পাড়ানি গানে পরিণত করতে পারে।...কী অসীম মোহিত করার ক্ষমতা এই ভাষার। আমি দেখলাম রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান কবি যেন

হাসি মুখে নন্দিত হৃদয়ে দুটি পাখির সঙ্গে কথা বলছেন। একটি হলো খাঁচার পাখি, আর একটি বনের পাখি। কবির কণ্ঠে, মূর্তিতে করুণা এবং স্নেহ এমনভাবে ফুটে উঠছে যে মনে হয় পাখি দুটি উড়ে এসে তাঁর কাঁধের ওপর বসবে।...

একদা আমি লিখেছিলাম যে কবিতা সর্বপ্রথমে আমাদের আনন্দ দেয়; তারপরে আমাদের সেই আনন্দের মধ্যে দিয়ে সুরু হয় কবিতাটিকে বোঝা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত কবিতাটির কোন অর্থই আমি ধরতে পারি নি যদিও ওর থেকে আমি যে আনন্দ পাচ্ছি তার অন্ত নেই। কিন্তু হঠাৎ মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে গেল একটা বোধ। সত্যি, কী মহৎ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কী মহৎ কবি উনি।"

এ যে এক সংবেদনশীল কবি এবং অনুবাদকের প্রশস্তি এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই লেখক যেমন নানান বিদেশী ভাষা থেকে উঁচুদরের কবিতা তর্জমা সুনিশ্চিত করেছিলেন তেমনি সদা সযত্নে হাঙ্গেরীয় ভাষা এবং সাহিত্যকে সুপথে পরিচালিত করেছিলেন। যে তিনটি সমালোচনার উল্লেখ করলাম সে সবগুলিই রবীন্দ্র রচনাবলী সম্পর্কে প্রশংসাবাচক। অবশ্য এঁদের তিনজনেরই কয়েকটি অসাধারণ সুযোগ ছিল। দেজসো কোস্‌জ্‌তোলান্‌য়ী রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি তাঁর সামনে বসে শুনেছিলেন। মিহালি বাবিৎস ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়তে পেরেছিলেন আর সকলেই জানেন যে রবীন্দ্র রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজি ভাষান্তর ঘটেছে গীতাঞ্জলিতে। এরভিন বাকতেরও ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে খুবই গভীর জ্ঞান ছিল।

বিশপ রাভাস্‌জ্‌ ছিলেন একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টির সমালোচক। তাঁর মত হচ্ছে: "বোধহয় তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কবিতা তুলনা করা চলে মেটারলিন্‌কের কবিতার সঙ্গে।" মরিস মেটারলিনক্‌ (১৮৬২-১৯৪৯) নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন এবং হাঙ্গেরীতে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল খুবই বেশী। দেজ্‌সো কোস্‌জ্‌তোলান্‌য়ী তাঁর

কবিতার তর্জমা করেছিলেন। মেটারলিনকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বেলা বালাজ-এর অতীন্দ্রিয়-নাটকে। বিশেষ করে বালাজ-এর বিশ্ববিখ্যাত 'কাঠের রাজপুত্র' নাটকটিতে। বেলা বারতোক-এর সঙ্গীত রচনা করেন। এই নাটকে ব্যবহৃত প্রতীকি সঙ্গীতের দিকে বালাজকে উদ্বুদ্ধ করেন মেটারলিঙ্ক। প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের অন্তরাত্মার গভীরতম ভীতিকে রূপ দেওয়ার রীতি তিনিই উদ্ভাবন করেন। বিশপ রাভাসজ্-এর মতামত ভেবে দেখবার মত।

১৯৩৫ সালে নোবেল পুরস্কারজয়ী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বুদাপেস্ত থেকে যে সংকলন বেরোয় তাতে এরভিন বাকতে রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর কিঞ্চিৎ ভিন্ন আলোচনা যুক্ত করেন। এতে বাকতে ১৯৩০-এর পরে হাঙ্গেরী এবং ইউরোপের অন্যান্য সব দেশে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ম্লান হয়ে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেন। বাকতে লেখেন: "প্রথমে কবি নিজেই তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করতেন এবং তাতে মৌলিক সব ধারণা এবং অনুভূতি বেশ স্বতস্ফূর্তভাবে ধ্বনিত হতো। কিন্তু লোভী প্রকাশকদের চাপে পড়ে এবং সম্ভবতঃ বিশ্বভারতীর ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রয়োজনের দাবী মেটাতে কবি শেষের দিকে অনুবাদ করতে লাগলেন অযত্ন করে। তারপর তিনি আবার অন্যদেরও অনুমতি দিলেন তাঁর লেখার ইংরেজি তর্জমা করার। কাজেই তাঁর সাম্প্রতিক অনুবাদগুলি আগেকার অনুবাদের রক্তহীন পাংশু পুনরাবৃত্তি। এইসব অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি আন্তর্জাতিক ঔৎসুক্যকে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছিল। এমন ঘটেছে যে যেমন তেমন-ভাবে করা একটি তর্জমায় পঞ্চাশটি স্তবকের একটি কবিতাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে আট-দশ পংক্তিতে মূল কবিতার সব মূল্যবান অংশকে বিসর্জন দিয়ে। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রবল প্রভাব ভারতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি অসুস্থ কবিকে বাধ্য করেছে

সারা পৃথিবী জুড়ে বক্তৃতা সফরে যেতে। এ কাজ তাঁর মনের পক্ষে খুব উপভোগ্য হয়নি, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কর্মের প্রতি জগতের আগ্রহকে অনেকটা পরিমাণে স্তিমিত করেছে। বর্তমানে কবি তাঁর অতিপ্রিয় শান্তিনিকেতনে সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে কাটাতেই পছন্দ করেন! তাঁর জগৎ-জোড়া খ্যাতি এবং অসাধারণ সাফল্য তাঁর পরবর্তী যুগের ইংরেজি তর্জমার উচ্চমানের ক্ষতি করেছে যদিও তার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিকে দোষ দেওয়া যায় না।

"হাঙ্গেরীর যে সব সাহিত্যিক প্রথম প্রথম মহা আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকেছিলেন তাঁরাও তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি। তাঁর সম্বন্ধে হাঙ্গেরীয়দের উৎসাহের উৎস ছিল সস্তা, অসার ও নিম্ন মানের অনুবাদগুলি। এই সব হাঙ্গেরীর অনুবাদের পেছনে দক্ষতা বা মুন্সিয়ানা ছিল না, ছিল না প্রাচ্যের বিশ্ববীক্ষণ বিষয়ক কোন জ্ঞান। তাতে রাবীন্দ্রিক মূল্যবোধের কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ফলে কয়েক বছর আগে যখন এই হিন্দু কবি হাঙ্গেরী সফর করলেন তখন তাঁর সম্বন্ধে যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল তার তেমন কোন প্রকৃত ভিত্তি ছিল না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীর কথা সবসময়েই ভালোবেসে স্মরণ করেন, বিশেষত বালাতোন ফুরর্দের কথা, কারণ ঐখানেই তাঁর হার্টের গুরুতর ব্যাধির উপশম ঘটে।"

বলা বাহুল্য, এই আলোচনার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯২৬-এর অক্টোবরে যখন রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীতে আসেন তখন এরভিন বাকতে ছিলেন ভারতে। হাঙ্গেরীতে কী ঘটেছিল তা তিনি স্বচক্ষে দেখতে পান নি। আমি যতদূর জানি, হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের সফরের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে বাকতে কোনভাবেই যুক্ত ছিলেন না। তাঁদের সম্বন্ধে বাকতে খুব ভাল ধারণা পোষণ করতেন না। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের খৃষ্টান সমালোচকরা বাকতে-কে ঐ ব্যবস্থাপকদের দলেই ফেলেছিল। সব কিছু বাকতের যেন মোহভঙ্গ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি এর পর থেকে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক

ধারণাকেই অনুকরণ করতে থাকেন এবং তিরিশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ নঙর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে বাকতের মতামত ভুল বলে ধরতে হবে। এই অভ্যর্থনা সবদিক দিয়েই অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। অবশ্য ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন দলের মনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করছিল। কোস্‌জ্‌তোলান্‌য়ী বা বিশপ রাভাজ এর মতো চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনকে নাড়া দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পমাধুর্য। হাঙ্গেরীর পি ই এন ক্লাব তাঁকে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে সম্মানিত বোধ করেছিল।

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার মতো। ভারতের গণজীবনে এবং রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে বাকতের মতামত আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে এবং অন্যান্য অনেকের মতো তিনিও রবীন্দ্রনাথ আর মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আবিষ্কার করেন। ভারতের সমস্যাবলীর নিরসন একমাত্র গান্ধীজির সামাজিক কার্যসূচীর মধ্যেই সম্ভব এমনটা যাঁরা বিশ্বাস করতেন বাকতে তাঁদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ১৯২৬-এ হাঙ্গেরীতে মহাত্মাজির ভাষণের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তখনো তিনি ভারতে যান নি। এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বইটি বেরোয় চার বছর আগে। তিনি ভারতে থাকেন ১৯২৯ অবধি এবং তার মধ্যে কিছুকাল কাটান গান্ধীজির আশ্রমে। এই সম্পর্কে তিনি মহোৎসাহে লেখনীচালনা করেন। সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ তাঁর কাছে পূর্বের মতো ছিল না। ১৯৩২ থেকে তাঁর ভাগ্নী অমৃতা শের গিল তাঁর নবীন শিল্পদক্ষতার সাহায্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পে একটি আধুনিক ধারা আনলেন যা 'বেঙ্গল স্কুল' বলে যে চিত্রধারা পরিচিত ছিল, তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাকতে অমৃতা শের গিলের চিত্রের উচ্চ প্রশংসা করলেন আর খুব কড়া মন্তব্য করলেন 'বেঙ্গল স্কুলের' বিরুদ্ধে। তিনি বললেন শেষোক্ত চিত্রধারা

বাস্তব থেকে উৎপাটিত কারণ তার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই ইত্যাদি সব কথা। বাকতে জার্মানদের পরিবর্তিত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। তবে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তাঁর মিউনিখের ছাত্রজীবন থেকেই জার্মানীর অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গে যোগ রাখতেন এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ধারণার কী রকম ওঠাপড়া চলছে তার খবর রাখতেন। তিনি পরে আর রবীন্দ্র কাব্যের প্রশ্নে কিছু লেখেন নি। ১৯৪৫ সালের পর থেকে তাঁর একমাত্র বিষয় ছিল ভারতীয় শিল্প। সেই চর্চা থেকেই শেষপর্যন্ত বাকতে-র বিরাট প্রকাশিত কাজ 'ভারতের শিল্প' (বুদাপেস্ত ১৯৫৮, ১৯৬৩-১৯৮১) জন্ম নেয়।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক হাঙ্গেরীতে প্রকাশিত নানা সব মতামতের এক দলের প্রতিনিধিত্ব খানিকটা পরিমাণে করতে পারে আনতাল সৃজের্ব-এর বক্তব্য। তিনি ছিলেন সাহিত্য-ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতিমান। তাঁর 'বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস' (বুদাপেস্ত ১৯৪১) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় পরিবারে ইংরেজি সভ্যতার ঐতিহ্য একশো বছরের-ও বেশী পুরোন। এই পরিবার একটি ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্তর্গত। এই আন্দোলনের লক্ষ্য সরলীকৃত, যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক প্রোটেস্টান্টবাদের খৃষ্ট ধর্মের সংশ্লেষণ। বৃটিশরা তরুণ হিন্দু কবি এবং জ্ঞানী পুরুষের প্রতি সানন্দ অভ্যর্থনাই জ্ঞাপন করেছিল, কারণ তিনি বৃটিশ রাজপুরুষদের বাধাদান না করে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বোঝাপাড়া স্থাপনের কথাই বলেছিলেন। যখন নোবেল প্রাইজ কমিটি ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তি-কামী চরিত্রকে সম্মান দেখানর জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে নাইটহুড উপাধি দান করল ১৯১৪ সালে।.....১৯১৯ সালের পর থেকে আমরা তাঁর কথা আর তেমন শুনতে পাই নি। যদিও জার্মানীতে তিনি তখন খ্যাতির শিখরে, তাহলেও সেখানেও লোকে তাঁকে বিস্মৃত

হলো অচিরেই। রবীন্দ্রনাথ একজন বহুমুখী লেখক। তিনি লিখেছেন আধ্যাত্মিক ধ্যানের ওপর (সাধনা) যাতে হিন্দু দর্শনের ব্যাখ্যা আছে ; লিখেছেন কবিতা (গীতাঞ্জলি, দা ক্রিসেন্ট মুন, দা গার্ডেনার প্রভৃতি); গভীর রসের প্রতীকী নাটক (রাজা); ভারতীয় জীবনের বাস্তবচিত্রসহ এবং ছোটগল্প (গোরা, শেষের কবিতা)। এই সবগুলিতেই পাওয়া যাবে ভারতীয় প্রথাগত গভীরতা এবং একধরণের উদ্দীপ্ত মরমিয়াবাদ যা ইউরোপে পৌঁছে স্থান পেয়েছে এখানকার মানুষের হৃদয়ে। এই মানুষরা মাঝারি ধরনের লেখা পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

আনতাল সৃজের্ব-এর বিবরণীতে যে কত সুস্পষ্ট ভুল ঢুকে পড়েছে, কত প্রকৃত তথ্যের অভাব রয়েছে তা সহজেই চোখে পড়ে। তিনি যে এমন শোচনীয় লেখা লিখবেন এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। কেন না, সাহিত্যের ইতিহাসের নানা বিষয় ও নানা ব্যক্তির ওপর তিনি অসংখ্য বই পড়তেন এবং তার ভিত্তিতে গড়তেন তাঁর নিজস্ব মত ; আর অনেক ক্ষেত্রেই এই সব মতকে বিশেষজ্ঞদের মত বলে মানা হয় এবং সেসবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে যথেষ্ট। বোঝা যায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠিক মতো অধ্যয়ন করেন নি এবং বিশের দশকের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিনি কেবলমাত্র অতীতের দিকেই চোখ ফিরিয়ে ছিলেন।

আসলে সৃজের্ব-এর এমন লেখার কারণ বুঝতে হলে অনেক গুলি ব্যাপার বিচার করতে হবে। ক্যাথলিক ধারার শিক্ষা যা তিনি অল্প-বয়সে লাভ করেন তা তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। তারপরে তিনি এলেন স্পেংলারের ডিক্লাইন অব দা ওয়েস্ট প্রতিফলিত সাংস্কৃতিক নৈরাশ্যবাদের আওতায়। এই দুই-এ মিলে মানব প্রগতি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ধারনা গড়ে ওঠে। একজন মার্কসবাদী লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন যে নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিকাশের অনেক খবরই তিনি পুরোপুরি রাখতেন না। সোভিয়েৎ সাহিত্য সম্বন্ধে

তাঁর সিদ্ধান্ত বেশ অপরিণত। তিনি তাঁর গ্রন্থে ভারতীয়, চীনা কিম্বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশের সাহিত্যকে স্থান দেন নি, এমন কি তিনি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ-ও করেছেন ইংরাজি সাহিত্যের প্রসঙ্গে।

এছাড়া, ভারতীয় মরমিয়াবাদ বা তথাকথিত মরমিয়াবাদের প্রতি তাঁর অদ্ভুত মনোভাবও আমাদের আশ্চর্য না করে পারে না। কারণ, তিনি ইউরোপীয় মরমিয়াবাদ যথেষ্ট গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অধ্যাত্মজগৎ তাঁর কাছে মোটেও অজ্ঞাত ছিল না। অধ্যাত্মবাদ-বিষয়ক এক বিরাট গ্রন্থের এক চমৎকার ভূমিকা তিনি লেখেন; এই বিষয়কে ভিত্তি করে একটি উপন্যাস-ও রচনা করেন; আর আধুনিক ইহুদী মরমিয়াবাদী ম্যাক্স বুবার-এর লেখা খুব খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। আবার কার্ল গিয়েলেরাপ-এর সফল উপন্যাস 'তীর্থযাত্রী-কামানিতা'-র মধ্যে তিনি খুব একটা ত্রুটি খুঁজে পান নি। এই উপন্যাসটির ঘটনাস্থল ভারত, কিন্তু সব কিছু ঘটেছে অলৌকিক পর্যায়ে। সামান্য আপত্তি যা তিনি জানিয়েছিলেন তা হলো এই: "গিয়েলেরাপ লেখার মধ্যে চিন্তাশীলতার ওপর ঝোঁক দেন। তবে তা বই-ঘেঁসা আর সেই সঙ্গে দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদে তাঁর দখল কতটা তার পরিচয় দেবার প্রচেষ্টায় ভরা"।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং রচনারীতির বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্যের জন্য অবশ্য দায়ী রবীন্দ্ররচনাবলীর হাঙ্গেরীয় ভাষায় অক্ষম অনুবাদগুলি। সজের্ব কেবল সেইসব বই-এর উল্লেখ করেছেন যা হাঙ্গেরীয়তে প্রকাশিত। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর সমালোচনা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু অনুবাদকরা এমন একটি কৃত্রিম রীতি অনুসরণ করতে থাকেন যার ব্যবহার করতেন এফ, ডব্লিউ, বায়েন প্রমুখ কৃত্রিম নামধারী ভারতীয় লেখকরা। আর সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো বায়েন এবং রবীন্দ্রনাথ একই কালে হাঙ্গেরীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এমনও অবশ্য হতে পারে যে ইয়েটস কিম্বা এজরা পাউণ্ডের

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন ভক্ত এবং বন্ধুরা তাঁকে যে তিরিশের দশকে পরিত্যাগ করেছিলেন আনতাল সর্জেব তার কথা জানাতেন।

১৯৬১ সালে সারা বিশ্ব যখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালন করল তখন সারা কারিগ সম্পাদিত একটি চমৎকার বই হাঙ্গেরীতে বেরোয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। এতে একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখেন ই, চৌথ। তাঁর প্রধান বক্তব্য হচ্ছে: "রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবনে তেমনি শিল্পে পেতে চেয়েছেন সর্বজনীনতাকে। তাঁর নিজের জীবন ও সুষমভাবে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল শিল্পের সঙ্গে। তাঁর সব রচনাবলী এবং সমগ্র কর্মজীবনেরই লক্ষ্য ছিল অতীতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আর মানব প্রগতির বিকাশকে সুসমঞ্জস ঐক্যে বাঁধা, প্রাচ্য প্রতীচ্যের কর্মধারা এবং মৈত্রীকে বর্ধিত করা, জগতে শান্তি আর পারস্পরিক বোঝাপড়াকে সুদৃঢ় করা, এবং মানব জাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বকে স্থাপিত করা। প্রগতির সঙ্গে দৃঢ়ভিত্তিক পশ্চাদপরতার, সত্য এবং মহত্বের সঙ্গে অসৎ এবং নীচতার, প্রেমের সঙ্গে ঘৃণার সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কোনরকম সংঘর্ষকে তিনি স্বীকার করতেন না। তাঁর রচনা শুধু ভারতে জন্যই নয়, তিনি সমস্ত মানব জাতির এক মহত্তম কবি।"

মাতিয়াস মাত্রাই-এর প্রবন্ধেও কিছু সুন্দর মন্তব্য আছে: "গীতিকবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ। অনুভূতি, চিত্রকলা এবং সুর তাঁর কবিতায় নিখুঁতভাবে মিলে গেছে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির জটিল ধারাগুলির এক নতুন এবং মহৎ সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন। তিনি বাঙলা ভাষাকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন এবং তার মধ্যে সংযোজিত করেছেন বিচিত্র সব বর্তমানকালীন এবং সর্বজনীন উপাদান।"

ইসতভান সোতা-এর প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ অথচ সমালোচনামূলক। তিনি হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে স্বাগত হয়েছিলেন তার একটি ছোট বিবরণ দিয়ে লিখছেন: এই কাহিনী ক্রমাগতই বদলেছে। তিরিশের দশকে ঐ অভ্যর্থনার কথা জনমনে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর রচনাবলীর প্রতি ঔৎসুক্যের অবদান ঘটায়।···রবীন্দ্রনাথের কিছু ইউরোপীয় ভক্ত তাঁর লেখায় পান নেহাৎ একটা অদ্ভুত বিদেশী স্বাদ আর অধ্যাত্মিক শিক্ষা। এঁদের রবীন্দ্রভক্তি খুবই উষ্ণ এবং তার কারণ তাঁরা কবিকে দেখতেন এক অতি-আদর্শবাদী বিশ্ববীক্ষার বাহক হিসেবে।···

"অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ছাপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে।···তাঁর গীতিকবিতা তেমনি সুক্ষ্মভাবে গঠিত যেমন তাঁর লোককাব্য-ভিত্তিক সৃষ্টিগুলি। রবীন্দ্রকাব্যের গভীরতম ধ্বনিগুলি মানবতাবাদী আনন্দে রঙীন এবং তাদের উৎস হচ্ছে মানব জাতির সমবেত সঙ্গীত।"

১৯৬৬ সালের ৭ই আগষ্ট (২২শে শ্রাবণ) লাস্‌জ্‌লো কারদোস নেপস্‌জাবাদাসাগ পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি লেখেন : "তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কবিতা ইউরোপীয় পাঠকদের সবচেয়ে কাছের জিনিস। এই কবিতায় পাওয়া যায় সুকুমার করুণা, রূপগত ঐশ্বর্য, প্রত্যক্ষ কিন্তু সৌন্দর্যে মহিমান্বিত বিচিত্র অনুভূতির আবহ এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের কল্পনাকুশলতা। মানুষের সম্মান, পবিত্রতা এবং সৌন্দর্যের ধারণাকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের সঙ্গে তেমনি সারা জগতের মানুষের সঙ্গে যুক্ত।"

আরেকজনের কথা শেষে বলব। ইনি হচ্ছেন জোসেফ ভেকেরদি। সংস্কৃত ভাষার এবং ভারতীয় সাহিত্যে এঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এঁর লেখা খুবই সংক্ষিপ্ত, তবুও তিনি কবির বিষয়ে মূল উপাদানগুলি উপস্থাপন করেছেন। এঁর বক্তব্য বিশ্বসাহিত্য-কোষ (বুদাপেস্ত ১৯৭০, প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের বাঙলা সাহিত্য পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। ইনি লিখছেন : "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আবির্ভাব হয় উনবিংশ শতকের আশির দশকে! তিনি তাঁর কাব্যে এবং সাহিত্যে ভারতীয় উপনিষদের ঈশ্বর ও সৃষ্টির

অভেদ-বোধকে খৃষ্টানধর্মের প্রেমের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন। কাব্যরীতির দিক থেকে তিনি জয়দেব থেকে পদাবলীকার এবং বাউলদের সমস্ত অধ্যাত্ম গীতি কবিতার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করে নবরূপ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি যুগ প্রবক্তাও বটে। জাতীয় সম্মান এবং সামাজিক সংস্কারের প্রতীভূও তিনি। তিনি কথ্য ভাষা ব্যবহার করে তার কাব্যকে সকলের পক্ষে উপযোগী এক সুর দিয়েছেন।"

এই অধ্যায় শেষ করার আগে আরো দুটি বিষয়ের সামান্য আভাস দেব। সে হচ্ছে চিত্রকর এবং সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। হাঙ্গেরীর জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বিষয়ে প্রায় কিছুই জানে না। এরভিন বাকতে তাঁর রবীন্দ্র-আলোচনায় অবশ্য সামান্য কিছু বলেছিলেন। তবে বাকতে পরে তার 'ভারতশিল্প' গ্রন্থে রবীন্দ্র চিত্রকলার বিরুদ্ধেই মত দেন—অবশ্য পরোক্ষভাবে। নাগিভিলাগে (১৯৭১-৬৫) তাঁর একটি চিত্র ছাপা হয়েছিল। আর, বিশ্ব-সঙ্গীত-কোষ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

হাঙ্গেরীর দৃষ্টিতে চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ

হাঙ্গেরী রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেছে একজন দার্শনিক, ভারতীয় দর্শনের প্রচারক এবং ভারতের চিরন্তন বাণীর বাহক হিসেবেও। তাঁর চিন্তা ও বাণী তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও বিভিন্ন দর্শনগত, ধর্মগত এবং সামাজিক প্রশ্ন তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর কিছু বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধে। এইরকম প্রবন্ধ সম্বলিত দুটি রবীন্দ্ররচনা হাঙ্গেরিতে পাওয়া যায়।

প্রথমটি হলো—সাধনা। এর অন্তর্গত আটটি প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে, "পশ্চিমের পাঠকদের সুযোগ হবে আমাদের পবিত্র প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এবং আজকের দিনের জীবনের প্রতিফলিত ভারতীয় মননের স্পর্শলাভ করার।" এতে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন উপনিষদগুলির চিন্তা ও ধ্যানের উপর।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে যে সব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছেন তা হলো :

১। একের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে উপলব্ধি
২। আত্মার চেতনা
৩। অন্যায়ের সমস্যা
৪। অহমের সমস্যা
৫। প্রেমের উপলব্ধি
৬। ধর্মের উপলব্ধি
৭। সৌন্দর্যের উপলব্ধি
৮। অসীমের উপলব্ধি

এইসব বিষয়ের অনেক প্রশ্নই উপনিষদে উত্থাপিত। কিন্তু সে

সবেরই এক নতুন ব্যাখ্যা এমনকি মূলের বিকল্পও পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথে। এই রাবীন্দ্রিক বিকল্প কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা হ্রাস করল ইউরোপীয়দের মধ্যে যখন বেদান্ত-উপনিষদ সম্বন্ধে ইউরোপের মানুষ বেশী করে জানতে আরম্ভ করলেন, যখন সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখদের নব নব ব্যাখ্যা তাদের গোচর হলো। এরভিন বাকতে হিন্দু বিশ্ববীক্ষার উপর একটি সঞ্চয়ন বার করলেন। তার নাম প্রথমে ছিল 'সনাতন ধর্ম চিরন্তন বিধি' (বুদাপেস্ত ১৯৩৬)। পরবর্তী সংস্করণে এর নাম হয় 'ভারতের জ্ঞান' (বুদাপেস্ত ১৯৪৩)।

সে যাই হোক, এখন ফিরে আসা যাক ১৯২০-তে যখন হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছে। সাধনার চতুর্থ খণ্ড —'অহমের 'সমস্যা' অনুবাদ করেছিলেন মারিয়া সৃজেনসেনিকস এবং আলফ্রেড রাইশ। ১৯২০-তে এটি বার হয় হাঙ্গেরীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটির তরফ থেকে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করে করা হয়েছিলো এবং স্পষ্টতই প্রকাশকদের উদ্দেশ্যে ছিলো রবীন্দ্রনাথকে একজন দর্শনশাস্ত্রের বিশারদ হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করা। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের যে ব্যাখ্যা দিলেন তাও ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। হাঙ্গেরীয় থিওসফিকাল সোসাইটি চালাতেন কতিপয় অস্বাভাবিক ধরণের লোক। তাঁরা প্রচলিত খৃষ্টধর্মে সন্তুষ্ট হতে পারেননি, আবার জড়বাদ, নাস্তিকতাবাদ বা মার্কসবাদের দিকেও অগ্রসর হননি। ভারতীয় পটভূমিকায় থিওসফিক্যাল আন্দোলনের নানা প্রগতিশীল দিক ছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার অবদান নেহাৎ কম নয়,—অ্যাডেয়ারে গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রও আছে। কিন্তু হাঙ্গেরীতে এই আন্দোলনের কোন বিশেষ প্রভাব ছিল না বলা চলে। তবুও, থিওসফিস্টরা হাঙ্গেরীতে প্রকাশন ব্যাপারে খুবই সক্রিয় ছিলেন। এঁদের হাতে ছিল 'থিওসফি নামে' এক পত্রিকা এবং মারিয়া সৃজেনসেনিকসের পরিচালনাধীনে একটি প্রকাশনা সংস্থা। এরা অ্যানি বেসান্টের কিছু রচনা, যেমন 'দ্য

মাস্টারস্' তর্জমা করে প্রকাশ করেছিলেন; নবীন কৃষ্ণমূর্তিকে হাঙ্গেরীর জনগণের সমক্ষে নিয়ে আসেন, অ্যানি রেসান্ট-এর ইংরেজী করা সমগ্র ভাগবদ্‌গীতা হাঙ্গেরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন (বুদাপেস্ত ১৯৪৪)। এই সকল প্রকাশনার মান অত্যন্ত আপত্তিকর এবং এদের এরভিন্ বাকতের কোন বই বা অধ্যাপক জোসেফ শ্‌মডিটের অসাধারণ সব কাজ—ভারতীয় দর্শন (বুদাপেস্ত ১৯২৫) এবং বুদ্ধের জীবন, শিক্ষা ও সংঘ (বুদাপেস্ত ১৯২০ এবং ১৯২৫) ইত্যাদির সঙ্গে কোনক্রমেই তুলনা করা যেতে পারে না। থিওসফিস্টরা রবীন্দ্রনাথের সাধনার অংশ বিশেষ নিজেদের মতো করে বার করে তাঁর প্রচুর ক্ষতিই করেছিলেন। কারণ অনেকেই থিওসফিস্টদের হাতের সব ভুল-ভ্রান্তি এবং অসত্য মিশ্রিত ঐ লেখাকে ধরে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই লেখা বলে। এই প্রকাশনা হাঙ্গেরীয় ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের, চার্চের রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে বাড়িয়ে তুলেছিলো। এ, উত্তলকেনবার্গ বলে বুদাপেস্তের এক ক্যাথলিক অধ্যাপক থিওসফির উপরে তখন এক প্রবন্ধ লিখে তাঁকে ধর্ম-বিরোধী বলে সাব্যস্ত করেন।

সাধনার সম্পূর্ণ অনুবাদের ভার নেন জোলতান বারতোস। সেটি ১৯২১-এ বার করেন প্রখ্যাত রেভাই প্রকাশনালয়। সাধনার এই সংস্করণের ভূমিকা লেখেন মিহালী ফোলডি। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান লেখক এবং পেস্তি হিরলাপ পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর সম্পর্কে কিছু বিতর্ক আছে, কারণ তিনি "প্রকৃতিবাদ থেকে গিয়ে পড়েছিলেন ক্যাথলিকদের নীতিবাগীশ পথে"। তাঁর লেখায় আন্তরিকতার অভাব থাকলেও ভ্রান্তি বা অসত্য কিছু নেই। এরপর সাধনা হাঙ্গেরীতে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে আর সেই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে আক্রমণও শুরু হয়ে যায়।

'ন্যাশানালিজম' বইটির হাঙ্গেরীয় ভাষায় অনুবাদের কাহিনী একটু ভিন্ন ধরনের। সান্দোর বার্তা (১৮৯৭—১৯৩৮) নামে এক নবীন

সমাজতান্ত্রিক কবি (ইনি বিদেশ থেকে হাঙ্গেরীতে এসে বসবাস করতে থাকেন) এটি অনুবাদ করেন। বার্তা ছিলেন তৎকালীন বিকাশমান প্রলেতারিয় সাহিত্যের এক প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন লেখক। তিনি প্রথমে প্রচলিত রচনারীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বরণ করেন বাস্তববাদকে। তাঁর সাধনার অনুবাদ প্রকাশিত হয় ভিয়েনায় ১৯২১-এ এবং তার কয়েকটি কপি হাঙ্গেরীতে লুকিয়ে আনা হয়। এটি কখনো খোলাখুলি ভাবে বিক্রীত হয়নি। যার জন্য বইটি ছিল অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অন্যতম।

নবীন এবং প্রতিভশালী লেখকরাই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন দার্শনিক ও চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথকে হাঙ্গেরীয় পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। সেটা বোধহয় হবারই কথা। কারণ ঐ লেখকরাই তখন হাঙ্গেরীয় ইতিহাসের দুরূহ পর্বের মধ্যে সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। আবার এরাই পরবর্তীকালে ফিরেছিলেন ক্যাথলিকবাদ অথবা মার্কসবাদ-এর দিকে।

অবশ্য পূর্ববর্তী অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথের দর্শন বা চিন্তাধারা সম্পর্কে খুব একটা গভীর ধারনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। কারণ সব অনুবাদগুলিই প্রকাশিত হয়েছিল সীমিত সংখ্যায়। আসলে হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের দর্শন বা চিন্তাধারাকে পরিচয় করাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল জার্মান ভাষায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থগুলি। এই প্রসঙ্গে জার্মান প্রকাশক কুর্ট ভুলফ্ ভেরলাগ এর নাম অন্যতম। হাঙ্গেরীতে অবশ্য এসব অনুবাদেরও বেশ ঘাটতি ছিল। কারণ সে সময়ে হাঙ্গেরীয় মধ্যবিত্ত সমাজের বেশীর ভাগ লোকেরই অভ্যাস ছিল জার্মান ভাষা পড়ার। 'ন্যাশানালিজম' এর কথাই ধরা যাক্। ষাটের দশকে তখন এই বই-এর হাঙ্গেরীয় অনুবাদ একেবারেই পাওয়া যেত না অথচ পুরানো বই এর দোকানে জার্মান অনুবাদ চোখে পড়ত। জার্মান অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করা মানে যে কেবল অন্য একটি ভাষার মাধ্যমে তাঁর কাছে

পৌঁছানো তা নয়। এই অনুবাদ এবং বিশেষ করে তার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের জগৎকে এক নতুন রূপে দেখায়। কেন যে জার্মানীর সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরীতেও রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি একই সময়ে বেড়েছে আবার কেন যে এই দুদেশেই তাঁর খ্যাতি একই সময়ে হ্রাস পেয়েছে, সেটা বুঝতে হলে আমাদের আর একটু ঘটনা প্রবাহের গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীতে সবচেয়ে কড়া লেখা লেখেন ক্যাথলিক চার্চের ইসতভান জাবোরস্‌কি। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি বই লেখেন। বইটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ববীক্ষা (বুদাপেস্ত ১১২৭)। ক্যাথলিকদের রবীন্দ্রবিরোধিতা ঠিক যে কি রকম ছিল তা বোঝাতে এই লেখাটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে:

"মতবাদ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসমাজ সম্বন্ধে ধারণা আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান এবং দর্শনের প্রধান গতির বেশ কাছাকাছি। দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টায় নানান দার্শনিক চিন্তাধারা হঠাৎ জনসাধারণের কাছে খুব সম্বর্ধনা পাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার যারা বিরোধী তাদের সুবিধে হচ্ছে হিন্দু এবং বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতবাদ নিয়ে উৎসাহিত হবার। যারা অলৌকিককে জীবন থেকে বর্জন করতে চায় তাদের কাছে যখন রবীন্দ্রনাথের লেখা পৌঁছল তখন তারা নিজেদের মতের সঙ্গে তাঁর মতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করল এবং সব জায়গায় তার উল্লেখও করতে লাগল। ঐ মহান মনীষী যে সব জীবন নীতির কথা বলেছেন তার ভিত্তিতে তারা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করতে শুরু করল অথচ আসলে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব বিষয়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্ম ঐতিহ্যকেই কেবল সমর্থন করে যাচ্ছিলেন।

"আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনা হলো এই

ভাবেই। খৃষ্টান-বিরোধী এবং রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষার মধ্যে একটা সহজাত মিল আছে। সে-মিল হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ সমরূপী নীতি—অদ্বৈতবাদের থেকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ধারণাকে ঘিরে।"

জাবোরস্‌জ্‌সকি নৌগাৎ নামে পত্রিকায় মিলিত লেখকদের দলটির উপরে খুবই খাপ্পা ছিলেন। তিনি মনে করতেন এই লেখক দলের অনেকেই এক ধরণের উদারনৈতিক প্রোটেস্টান্টবাদের প্রতিনিধি বা প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে এই মতবাদ হলো প্রকৃত খৃষ্ট ধর্মের এক নিকৃষ্ট বিকল্প যা মূল খৃষ্টান মতবাদ থেকে অনেক দূরের বস্তু। তবে এরকম ধর্ম অনুসরণকারীদের আশাও পূরণ হতে পারে যদি তারা অলৌকিক ঘটনাবলী এবং সেই সংক্রান্ত অধ্যাত্ম-বাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। জাবোরসজ্‌স্‌কি দুঃখিত যে তারা যা করছে তা হলো রবীন্দ্রনাথের সেই সকল ধারণাতে মন দেওয়া যার অস্তিত্ব আছে কেবল প্রোটেস্টান্টদের স্বপ্নের মধ্যে।

তিনি বিভিন্ন বিরোধীমতবাদীদের এক ফিরিস্তি তৈরী করে তাদের বিরুদ্ধে একই ধরণের মত পোষণ করার অভিযোগ তোলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল: হাঙ্গেরীয় একেশ্বরবাদীরা তাঁকে (রবীন্দ্র-নাথকে) তাদের নীতির সমর্থক বলে মনে করে; থিওসফিস্টরা তাঁকে এক নিখুঁত ধর্ম এবং দৈব প্রত্যাদেশের বাঙ্‌ময় প্রতিভূ বলে জ্ঞান করে; সমাজ বিজ্ঞানীরা তাঁকে ধরে নেয় ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমী সভ্যতার সংস্কারক হিসাবে; আর উদারনৈতিক মুক্তচিন্তার ধ্বজা-ধারীরা তাঁর মধ্যে দেখে চৈতন্যের স্বাধীনতার স্বাভাবিক উপলব্ধির এক প্রতীককে। জাবোরসজ্‌সকি সাধনার কোন কোন ধারণাকে "বলশেভিক মতাদর্শ" এবং কয়েকটি মতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরীর উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের মতের সঙ্গে যুক্ত করতেও সংকোচ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে 'সাধনা' থেকে উদ্ধৃতির অংশ একটু বড়ই করতে হবে:

"উপনিষদের ধারণায় নিখিল চৈতন্য এবং ঈশ্বর চেতনার সোপান রয়েছে আত্মার চেতনায়। অহংকে বিসর্জন দিয়ে আত্মার সাধনার দ্বারাই মুক্তি উপলব্ধি করা সম্ভব। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে আমাদের আত্মাই আসল বস্তু। সেই জানা তখনই ঘটতে পারে যখন আমরা অহং-এর উপর নিশ্চিতভাবে জয়ী হতে পারি। সমস্ত গর্ব, লোভ, ভয়কে ছাড়িয়ে উঠতে পারি এই বোধের মধ্য দিয়ে যে সব জাগতিক ক্ষতি এবং শারীরিক মৃত্যু কখনই সত্য থেকে, আমাদের আত্মার মহত্ত্ব থেকে কোন কিছুই হরণ করতে পারে না। পাখির ছানা যখন ডিমের খোলার আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সে জানে যে ঐ খোলা যা তাকে এতকাল আবৃত করে রেখেছিলো, তা তার জীবনের কোন অংশই নয়। ঐ খোলা তো মৃত, তার কোন বিকাশ নেই; বাইরে যে বৃহৎ অস্তিত্ব রয়েছে তার কোন আভাস ঐ খোলা দিতে পারে না। এই খোলা যতই আনন্দের, যতই নিখুঁত হোক বা যতই নিটোল হোক, তাকে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, যাতে আলো হাওয়ার মধ্যে মুক্তি লাভ করা যায়। সংস্কৃত ভাষায় পাখীকে তাই বলা হয় দ্বিজ। মানুষকেও তাই বলা যায় যখন সে আত্মসংযমের এবং মহতী চিন্তার অন্তত একবার বছরের পর্বের মধ্য দিয়ে নিজের সমস্ত চাওয়াকে সরল করে, হৃদয়কে শুচি করে জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় নিরাসক্ত উদার চিত্তে। তখন ধরে নেওয়া হয় যে অহং-এর অন্ধ আবরণের ভিতর থেকে তার পুনর্জন্ম হয়েছে আত্মার মুক্তিতে। সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে তার জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, সে মিশে গেছে সর্বব্যাপী পরমের সঙ্গে।"

সেই সময়কার কোন মূল সমাজতান্ত্রিক লেখার সন্ধান পাওয়া যায় না যার থেকে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায়। কোন কোন ব্যাখ্যায় হয়তো আত্মার মুক্তি উপলব্ধি আর বর্ধিষ্ণু সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে এক করে দেখা হয়েছে। খুব ব্যাপক অর্থে

হয়তো এর দ্বারা মানব জীবনের চরম উন্নতির প্রচেষ্টার কথা বোঝান হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে আধুনিক খৃষ্টীয় ধারণা আর উপরোক্ত ধারণার মধ্যে কোন বিরোধ না থাকার সম্ভাবনা বেশী। জাবোরস্‌জ্‌সকি যে তাঁর মন্তব্য করেছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে সেটাই সন্দেহ হয়। সাধনাতে প্রধানতঃ মানবাত্মা আর পরমাত্মার প্রসঙ্গেই সব কিছু বলা হয়েছে। সুতরাং ১৯১৯ সালের সমাজতান্ত্রিকরা সাধনার মতামতকে নিজেদের বলে মনে করতেন বলে মনে হয় না। গোঁড়া ক্যাথলিকরা অবশ্য আপত্তি করার মতো পেতে পারতেন কেবল উপনিষদের ঈশ্বর ও সৃষ্টির অভেদ তত্ত্বকে। জাবোরস্‌জসকি আরো একটি বিস্ময়কর মন্তব্য করেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা নাকি একেবারে সেকেলে ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

জাবোরস্‌জসকি আরো বলেছিলেন যেঃ "রবীন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছেন যে মানব চরিত্র ভালো এবং সকলেই সেই অবস্থায় পৌঁছাতে পারে যেখানে কোন পুরস্কার-প্রতিদানের কথা না ভেবেই সে ভালো কাজ করবে ভালোর জন্যই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পাপের ভাগ যে সব মানুষকে নিতে হয় এবং ফলে মানব চরিত্র স্বভাবতই মন্দর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সেই ঝোঁককে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন, এমন কি তার অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দিয়েছেন।"

এরপর তিনি বলেছেন স্বজ্ঞা আর অধ্যাত্মবাদ নিয়েঃ "হার্টম্যান, বের্গসঁ, রবীন্দ্রনাথ···মনে করেন যে কেবল প্রজ্ঞাসম্ভূত জ্ঞানই আমাদের সেই প্রত্যয় দিতে পারে যা পরম এবং সুনিশ্চিত সত্যের অভিমুখে চালিত করে।

"মানুষ সৃষ্ট জীব, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা; মানুষ সীমিত, ঈশ্বর অসীম। কাজেই মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে পাওয়া, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়।

"সেই কারণেই আমরা রবীন্দ্রনাথের মত বা অধ্যাত্মবাদকে

মানতে পারি না। কারণ এই মতবাদ দাবী করে যে মানুষ অসীমের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং এভাবেই মানুষ তাঁকে চিনতে পারে।"

"এরপর তাঁর ইঙ্গিত একেশ্বরবাদের প্রতি। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে জগৎ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র এবং তার চলার কারণ তার মধ্যেই নিহিত, তাহলে কোন ব্যক্তির ভগবান, যিনি জগৎ থেকে পৃথক এবং বৃহত্তর, তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অথচ রবীন্দ্রনাথ আর একেশ্বরবাদীরা সেই অপ্রমাণিত বক্তব্যেই আটকে আছেন। অভিজ্ঞতা এবং যুক্তিবাদী অবরোহ কিন্তু একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত করে, তা হলো—এই জগতের মধ্য থেকে এই জগতের অস্তিত্বের যথাযথ কারণ আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।"

এবার জাবোরস্‌জসকির শেষ বক্তব্য: "আমরা রবীন্দ্রনাথকে এমন একজন মানুষ বলে স্বীকার করব যিনি মহৎ এবং শিবকে লাভ করতে সচেষ্ট। আমরা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসকেও প্রশংসা করব যার দ্বারা তিনি পশ্চিমের বিরুদ্ধে হিন্দু বিশ্ববীক্ষাকে রক্ষা করেছেন। তাঁর ন্যাশনালিজম বই-এ তিনি এ মত প্রায়ই ব্যক্ত করেছেন যে পশ্চিম তার সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অন্তে বশম্বদভাবে প্রাচ্যের দিকে তার শিক্ষালাভ করার জন্য ফিরবে, সেই মতের প্রতিও আমরা সশ্রদ্ধ থাকবো। তবে, বস্তুগতভাবে আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না যে ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে কেবল হিন্দু বিশ্ববীক্ষার দ্বারাই নব জীবন সঞ্চারিত হবে।

জাবোরস্‌জসকি যে রবীন্দ্রনাথকে বের্গসঁর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখা যেতে পারে। অবশ্য উক্ত মত সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করার জন্য একটা আলাদা প্রবন্ধ লেখা দরকার। সে যাই হোক বের্গসঁ যখন মানুষের প্রজ্ঞা এবং ধর্মের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন এখন তার কিছু কিছুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামতের সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু এটা

আমাদের জানা নেই যে রের্গসঁর ধারণায় ঈশ্বর ব্যক্তিগত অথবা সৃষ্টির সঙ্গে অভেদ ছিলেন। রের্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ কেবল এই লিখেছেন: "অঁরি রের্গসঁর সঙ্গে বাবার কয়েকটি দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল।" রথীন্দ্রনাথ আরো একটু যোগ করেছিলেন: "এইসব আলোচনার একটি প্রতিবেদন তখন প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ণ রিভিউ-তে। সেটি লিখেছিলেন সুধীর রুদ্র। তিনি ঐ আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন। আমি পরে শুনেছিলাম যে তাঁর অনুমতি ছাড়াই একটি লঘু আলাপের প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যাপারটা রের্গসঁর পছন্দ হয়নি।" এই অনুচ্ছেদ থেকে আভাস পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথও রের্গসঁ যে আলাপ আলোচনা করেছিলেন তা বড়জোর একের সঙ্গে অন্যের মত বিনিময়, সে মত হয়তো খুব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতও নয়। দুই ঘনিষ্ঠ মনীষীর চিন্তার সংযোগ তাকে বলা যায় না। নান্দনিক অভিজ্ঞতা-সম্পর্কিত তাঁদের সাধারণ মতামতের মধ্যে এই দুজনের বিশেষ নৈকট্য কখনো লক্ষ্য করার মত ছিল না। আর ঐসব মতামত তো শুধু ওরা দুজনেই নয় আরো অনেকে পোষণ করতেন। নারাভানের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, যদিও সেটি খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। নারাভানে লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ রের্গসঁর মত মনে করতেন যে নান্দনিক অভিজ্ঞতা আমাকে নিয়ে যায় 'বাস্তবের অন্তঃস্থলে' যেখানে আমরা দেখতে পাই 'ভিতর থেকে'। যখন দার্শনিক ব্যাপৃত থাকেন বিমূর্ত অনুমানে তখন শিল্পী বাস্তবকে লাভ করেন প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।"

জাবোর্‌স্‌জস্‌কি কি তাহলে বিদেশী প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন? সে কথাও বলা শক্ত। কারণ তিনি যে খুব দীর্ঘ কোন অধ্যয়নে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন তেমন কিছু তিনি বলে যাননি। ইংল্যাণ্ডে বা ফ্রান্সে যে সব নানা ব্যাপার ঘটেছিলো সে বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ অঁরি

ম্যাসি-র 'প্রাচ্যের আবেদন' (প্যারিস ১৯২৫) যার পরবর্তী নাম 'পশ্চিমের পক্ষে' (১৯২৭) তার ব্যবহার তিনি করেছিলেন বলে মনে হয় না। এই কু-খ্যাত বই-এ ম্যাসি রবীন্দ্রনাথ, কেইজারলিং, গান্ধীজী এবং লেনিন—এই চারজনকে উল্লেখ করেন এশিয় আক্রমণ-কারী দল হিসেবে যারা খৃষ্টীয় ইউরোপের পরম শত্রু। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ১৯৪৫ সালের ১০ই জুন যে খবর বেরিয়েছিল সে ধরনের সব বিবরণীর খবরও জাবোর্‌সজসকি রাখতেন না। সেই বিবরণীতেই লেখা হয়েছিলো: "সুকুমার বাঙালী লেখক এবং মরমীয়াবাদী রবীন্দ্রনাথের ভক্তরা একটা উপদ্রব হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। এই ব্যক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোকেরা যাঁরা খৃষ্টধর্ম বিরোধিতার ক্ষীণতম ইঙ্গিত লক্ষ্য করলেই বিশ্বাস করবার ক্ষমতায় একেবারে অন্তহীন হয়ে ওঠে। আর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা যথেষ্ট মাত্রাতেই আছে।"

হাঙ্গেরীতে ধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণের ব্যাপারে এরভিন বাকৃতে-ও জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রবীন্দ্রনাথের ওপর লেখা বইটি-তে তিনি জানিয়েছেন যে হাঙ্গেরীয় ধর্মযাজকদের তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি তাঁর পূর্বতন এক রচনায় (সম্ভবতঃ ১৯২৯-এ লেখা ছোট বইটি-তে) খৃষ্টধর্মীয় নীতির সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাকে যুক্ত করেছিলেন। বাকৃতে লিখছেন: "যখন পশ্চিমের বিজ্ঞান অথবা ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় ভারতীয় দর্শন অথবা ধর্মের উপর ঈশ্বর এবং সৃষ্টির অভেদ-তত্ত্বের বা একেশ্বরবাদের এবং বৌদ্ধনীতির উপর নাস্তিকতা বা নৈরাশ্য-বাদের লেবেল এঁটে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু ভারতীয় চিন্তার মূল ধারাকে ব্যাখ্যা করা হয় না এবং তার দ্বারা পশ্চিমের বিজ্ঞান এবং ধর্ম শাস্ত্রীদের বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ করার ক্ষমতার অভাবই সূচিত হয়। ভারতবর্ষে কোনদিনই 'একমাত্র সত্য ধর্ম' বলে কোন ধারণা প্রচলিত ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথের আরো কড়া সমালোচক ছিলেন হাঙ্গেরীর প্রোটেস্টাণ্ট চার্চের সদস্য বিশপ লাস্‌জলো রাভাস্‌জ। রবীন্দ্রনাথ বুদাপেস্তে ২৭-শে অক্টোবর যে বক্তৃতা করেন তিনি তার ওপরে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অশান্তি-ক্লিষ্ট পশ্চিমের প্রতি প্রাচ্যের আহ্বান বাণী'। বিশপ রাভাস্‌জ্‌-এর বক্তব্য মোটামুটি এই ছিল: "রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষায় কর্মের স্থান খুবই কম। এর কারণ যুক্তিসংগত ভাবেই বলা চলে তাঁর পূর্ব দেশীয় চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ চান ধ্যানের জীবন। তিনি হয়তো ইউরোপের সমস্যা বুঝতে পারেন এবং তার প্রতি তাঁর সহানুভূতিও থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের আনন্দ কোথায় তার নিশানা তাঁর কাছে নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শত্রু এবং তাঁদের ওপর অত্যাচারকারীদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত কারণ এঁদের সকলকেই তিনি দুঃখের সঙ্গী বলে মনে করেন। এই দৃশ্যমান জগতের সাধারণ কারাগারের পীড়নের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পক্ষে না হয়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যদিও দৃঢ় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অধিকারী, কিন্তু যখন তিনি ইতিহাস, ঐতিহাসিক অগ্রগতি এবং সামাজিক নীতি সম্পর্কে বাগবিস্তার করেন তখন অজ্ঞতা এবং হাস্যকর সারসের পরিচয় দেন। এর জন্য দায়ী ইউরোপীয় ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানাভাব।"

সবচেয়ে লক্ষণীয় এক ব্যাপার হলো বিশপ রাভাস্‌জ-এর কাছে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মহত্তর হচ্ছেন সাধু সুন্দর সিং, যিনি ভারতে সব খৃষ্টান মিশনের পক্ষে সহায়তা করে অনেক কাজ করেন এবং সেই কাজকে বিশপ রাভাস্‌জ্‌ রবীন্দ্রনাথের হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে শ্রেয়তর বলে সোজাসুজি রায় দেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জগৎ নঙর্থকভাবে প্রতিভাত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অন্যান্য সব মতামত বিচার করার আগে সাধনায় তিনি কি বলেছেন দেখা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য হলো: ভারতের

প্রাচীনকালের প্রচারকরা জগৎ-কে এবং ব্যক্তিস্বরূপ-কে পরিত্যাগ করেছিলেন—যার ফল শূন্য নাস্তি-তে গিয়ে দাঁড়ায়। এই ধারণার বিরুদ্ধে আমি আমার শ্রোতৃবৃন্দকে আগেও সাবধান করেছি, এখনও আবার করছি। ভারতের জ্ঞানী পুরুষদের লক্ষ্য ছিল আত্মার উপলব্ধি বা অন্যভাবে বলতে গেলে জগৎ-কে পরম বিশ্বাসের মধ্যে পাওয়া। যখন যীশু বলেছিলেন—"নম্ররাই ধন্য, কারণ জগৎ-কে লাভ করবে তারাই"—তখন তিনি ঐ একই কথা বুঝিয়েছিলেন। তিনি এই সত্য ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষ অহং-এর গর্ব পরিহার করেই এই জগতে নিজের প্রকৃত পাওয়ায় সম্মুখীন হয়। তখন তাকে জগতে নিজের স্থান করে নেবার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না। সে স্থান তখন সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়ায় তার আত্মার অমর অধিকারে। অহংকার ব্যাহত করে আত্মার প্রকৃত ক্রিয়াকে। সেই ক্রিয়া হলো বিশ্বের সঙ্গে এবং বিশ্ববিধাতার সঙ্গে তার মিলনকে পরম এবং সর্বাঙ্গীন করে তোলা।

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যকে উপদেশে বলেছেন, "আমি সত্যই কর্মকে পরিত্যাগ করতে বলেছি কিন্তু কেবল সেই কর্মকে যা বাক্যে, চিন্তায় এবং ফলে নিয়ে যায় অশুভের দিকে। ঠিকই আমি বিনাশের কথা প্রচার করেছি কিন্তু তা হচ্ছে আত্মগর্বের, লালসার, কু-চিন্তার এবং অজ্ঞতার বিনাশ—ক্ষমা, প্রেম, দয়া এবং সত্যের বিনাশ নয়।"

মনে হয় উপরোক্ত রবীন্দ্র-বাণী ভেবে দেখার যোগ্য। জীবনকে অস্বীকার করার আলোচনা আসলে বেড়ে গেছে অ্যালবার্ট সোয়াইটজারের দুটি বই বেরোনর পর। প্রথমটি হলো: 'ভারতীয় চিন্তা এবং তার বিকাশ' (১৯৩৫) এবং 'আমার জীবন ও চিন্তা' (১৯৪৫)। প্রথম বই-এ সোয়াইটজার লিখছেন: 'সব চিন্তার সঙ্গেই দুটি সাধারণ মৌলিক প্রশ্ন জড়িত থাকে—প্রথমটি হলো জগতের সমস্যা এবং তাকে স্বীকারের বা অস্বীকারের সমস্যা।

দ্বিতীয়টি হলো, নীতিবোধের সঙ্গে বিশ্ব এবং বিশ্ববিধাতার সম্পর্কের সমস্যা। জগৎকে অস্বীকার করলে নীতিবোধও শূন্যে পর্যবসিত হয়। আর অহিংসা যা নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তার উৎস করুণাবোধে নয়, তার জন্ম জগৎ থেকে দূরে সরে এসে নিজেকে শুদ্ধ রাখার প্রবণতায়। অহিংসার সঙ্গে করুণাবোধের ধারণা যুক্ত হয়েছে অনেক পরের যুগে।'

বিশ্ববীক্ষার মধ্যে জীবনকে অস্বীকার করার ব্যাপারটা আসলে একেবারেই অবাস্তব। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববীক্ষার মধ্যে আরেকটি বড় পার্থক্য আছে। তা জগৎ এবং জীবনকে স্বীকার এবং অস্বীকারের মধ্যেকার মতোই গভীর এবং ব্যাপক। সে পার্থক্য হলো এই যে ভারতীয় ধারণা একেশ্বরবাদী এবং মরমিয়া-বাদী। আর আমাদের হলো দ্বৈত বিশ্বাসী এবং তাত্ত্বিক।

"জ্যোরদানো ব্রুনো-ক ঈশ্বর এবং সৃষ্টির অভেদ তত্ত্ব আনলে একেশ্বরবাদী আধ্যাত্মিকতারই এক রূপ। স্কীনোজা, ফিরাতে, পেলিং এবং হেগেল নিজেদের ব্যাহত রেখেছিলেন অসীম পরমাত্মার সঙ্গে মানুষের আধাত্মিক মিলন নিয়ে।

"ভারত যে জগৎ এবং জীবনকে অস্বীকার করে তার নিয়ামক হচ্ছে জগতের উর্ধ্বে ওঠার আনন্দের উপলব্ধি। এই অস্বীকৃতির বৃদ্ধি ঘটে আনন্দের মধ্য দিয়ে জগতের থেকে দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

"রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং বিবেকানন্দ যতটা হিন্দু বিশ্ববীক্ষার অগ্রগতি ঘটাতে চেয়েছেন ততটা এই ধারণাকে বাস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন নি। এই জন্যেই তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি যে কর্মের উপরে প্রেমের নীতিকে স্থান দিয়ে তাঁরা জগৎ এবং জীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তাকে অস্বীকারই করছেন। তাঁরা ভাবতেন যে ব্রাহ্মণ্য অধ্যাত্মবাদকে নীতিগত এবং জীবন স্বীকৃতির অন্তর্গত

করে তার একটা নব ব্যাখ্যা দেবেন। যেন কোমল পর্দায় বাঁধা সাঙ্গীতিক রচনাকে আবার কড়া পর্দায় রূপান্তরিত করা চলে। বস্তুত, তাঁরা নীতিবাদী এবং জগৎ আর জীবনকে—স্বীকৃতিদায়ক অধ্যাত্মবাদের প্রবল সমস্যাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারা এখনো মূর্ত সত্য এবং বাস্তবভিত্তিক সত্য সম্বন্ধে খুব দৃঢ় নয়, হয়তো ভারত স্বাধীন হয় নি বলেই এমনটা ঘটছে।"

এই হলো সোয়াইটজার-এর মূল বক্তব্য। এর সমালোচনার জন্য আমি এন. কে. ওয়েভারাজা-র 'হিন্দুইজম অ্যাণ্ড দ্য মডার্ণ এজ' নামে বইটির উল্লেখ করব এবং তার থেকে কেবল একটি মূল্যবান উক্তি পাঠকদের সামনে ধরব: 'সোয়াইটজারের মন্তব্য অপ্রতুল যুক্তি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে ক্রিয়াশীল-সৃষ্টিশীল দিকটি অর্থাৎ কর্ম, প্রাত্যহিক শ্রম, অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ব্রাহ্মণ্য-সমস্যা যা সোয়াইটজারের মতাদর্শগত চিন্তার ভিত্তি, সামগ্রিক সমস্যাটির একদিক মাত্র।'

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-ও এই প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'সোয়াইটজার বেশ তীক্ষ্ণভাবেই চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদ এবং দ্বৈততত্ত্বের মধ্যে যাওয়া আসা করছেন যেন উভয়ের মধ্যে কোন ফারাক নেই। সীমা আর অসীম নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলা রবীন্দ্রনাথের বেশ প্রিয় ব্যাপার—আর সেটা পেশাদারী দর্শনের চোখে বেশ সুদক্ষ উদ্ভাবন হিসেবে প্রতিভাত হবে। তিনি নীতিগত ব্যক্তিত্ব তো বটেই, এমন কি অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক কারণ সম্বন্ধে চিন্তার আয়াসকেও স্বচ্ছন্দে বাদ দেন।

"সোয়াইটজারের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও একথা আমরা না বলে পারি না যে এই দার্শনিকও তাঁর আত্মজীবনীতে ভুল করেছিলেন। জ্ঞান আর শক্তির বিজয়ের জন্য, মানুষের বহির্জীবনে এবং সমাজের

উন্নতির জন্য সবরকম প্রচেষ্টাকে ভারতীয় চিন্তাধারায় মূঢ়তা বলে ধরা হয়ে থাকে—এই মর্মে সোয়াইটজার যে খুব দৃঢ় মন্তব্য করেছিলেন সেটা তাঁর ভুল। সমগ্র ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতি উক্ত মন্তব্য কখনোই প্রযুক্ত হতে পারে না। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য যতই সীমিত হোক না কেন, তিনি নিজস্ব কল্পনারঙিন রূপে হলেও সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত জীবনকে স্বীকারের মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছিলেন—যে ঐতিহ্য একই সঙ্গে স্বাগত এবং শ্রদ্ধা জানায় বিজ্ঞানের বিকাশ, জ্ঞানের অগ্রগতিরও পশ্চিমের উত্তরাধিকারকে, কেননা তার মধ্যেই নিহিত আছে সমাজকে এবং তার পরিবেশকে বদলানোর শক্তি।"

বিশপ রাভাস্‌জ্‌ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন আলবার্ট সোয়াইটজারের প্রথম বই বেরোবার অনেক আগে। কিন্তু দুজনেই একটি ধারণা—কর্ম বর্জন (যা সোয়াইটজারের ভাষায়, জগৎ আর জীবনকে অস্বীকার) নিয়েই বক্তব্য বিস্তার করেছিলেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই হলো প্রোটেস্টান্ট নীতিবাদী শিক্ষার যুক্তিসংগত পরিণাম। এই শিক্ষা প্রোটেস্টান্টবাদের মধ্যে ছিল চিরকালই। আর পরে আবার তার পুনরুত্থান ঘটে জার্মান দার্শনিক ম্যাক্‌স্‌ ওয়েবারের লেখায়। ওয়েবারের লেখা প্রকাশিত হয় জার্মান ভাষায় ১৯০৪-১৯০৫-এ। তার ইংরেজি তর্জমা হয় তিরিশের দশকের প্রথম দিকে। বিশপ রাভাস্‌জ্‌ অবশ্য বহু হাঙ্গেরীয় ধর্মতাত্ত্বিকের মতো জার্মানীর দর্শন শাস্ত্রের বা প্রোটেস্টান্ট ধর্মতত্ত্বের নব নব বিকাশের সমস্ত হালফিল খবরই রাখতেন।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের জ্ঞান এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশপ রাভাস্‌জ্‌-এর সমালোচনার প্রসঙ্গে এই বই-এর শেষ অধ্যায়ে আসা যাবে। এখন আগের বিষয়টির অন্য এক দিকে মোড় ফিরব।

তৎকালীন খৃষ্টান মিশনারীদের মনোভাবের প্রকাশ বিশপ রাভাস্‌জ-এর লেখার সবচেয়ে প্রকট তাঁর সাধু সুন্দর সিং-এর

প্রশস্তিতে। মানতেই হবে যে এর মধ্যে তাঁর পড়াশুনোর ব্যাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৫ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিশতার সিনসিনাটিতে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী এবং সাধু সুন্দর সিং। এ, জে, অপ্পাস্বামী তাঁর 'সুন্দর সিং—এ বায়োগ্রাফি' (মাদ্রাজ ১৯৬৬) বই-এ লিখেছেন: "বক্তা (অধ্যাপক রিশতার) উপরোক্ত তিন ব্যক্তিকে নব ভারতের জীবন ও চিন্তার তিনটি দিকের প্রতিভূ বলে জ্ঞান করেন। রবীন্দ্রনাথ কবি ও ঋষি, ভারতের বুদ্ধিজীবিদের নব জাগরণের প্রতিনিধি, মহাত্মা গান্ধী ভারতের ঐক্যের জন্য এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা। সুন্দর সিং একজন অধ্যাত্মবাদী; তিনি চান খৃষ্ট ধর্মের ভিত্তিতে এক নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠা।"

বিশপ রাভাস্‌জ্‌ সম্ভবত টুড্‌গার্টের এভাঞ্জেলিক মিশনারীদের তরফ থেকে প্রকাশিত সুন্দর সিং-এর লেখার জার্মান অনুবাদ পড়েছিলেন। সে সময়ে খৃষ্টান চিন্তানায়কদের লেখায় খৃষ্টধর্মায়িত ভারত-বিষয়ক উল্লেখ প্রায়ই দেখা যেত। কিন্তু ভারতের সমাজ এবং ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকে একটু নজর দিলেই বোঝা যাবে যা ঘটেছে তা একটু আলাদা। বিশপ রাভাস্‌জ্‌ ইউরোপীয় ইতিহাসে অজ্ঞতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। কিন্তু তিনি নিজেও জাতীয় সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে আধুনিক ভারতে সামাজিক বিকাশের ধারা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের অভাব প্রদর্শন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা নিয়ে হাঙ্গেরীতে যে মার্কসবাদী সমালোচনা হয়েছিল তা অবশ্য নেহাৎ প্রাথমিক স্তরের ছিল। এর মধ্যে অধ্যাপক সোতার-এর বক্তব্য ছিল, যুক্তিহীনতাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুগে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। তখনকার দিনে প্রাচ্যের ধর্ম এবং জ্ঞান নিয়ে একটা অনিশ্চিত ধারণা

খুব প্রচারিত ছিল। এর মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না, কারণ ধর্ম আর জ্ঞানের মধ্যে সে ধারণা অনুযায়ী খোঁজা হতো মরমিয়াবাদকে। রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমের ওপর প্রভূত প্রভাবে প্রথম ধাক্কায় দেখা গেল সে-প্রভাব পূর্ণ হয়েছে এক অলীক মূর্তিকে ঘিরে, আর সেই জন্যেই তা আস্তে আস্তে লোপ পেল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যা পরবর্তী যুগে রূপ নিয়েছিল তা যুক্ত ছিল কোন অলীক মূর্তির সঙ্গে নয়, ছিল এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে। সে ঘটনা হচ্ছে এশিয়া আর আফ্রিকার সব জাতি যারা বহুদিন ধরে উপনিবেশ-বাদের শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল, তাদের অভ্যুত্থান। যেমন স্বদেশের তেমনি সমগ্র মানবজাতির মহত্ত্ব, মুক্তি এবং উন্নতির জন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা যে কী রকম ছিল তার মূল্য দিতে পারবেন তাঁরাই যারা ঐ ধরনেব কর্মে নিজেরা ব্যাপৃত।

এডিথ টোথ এবং মাতিয়াস মাত্রাই সমালোচনা করেন নি, করেছিলেন মন্তব্য। প্রথমোক্ত লেখিকা জোর দিয়েছিলেন রবীন্দ্র-নাথের উগ্র-জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধতা এবং নিজের দেশের জাতীয়তা-বাদকে-ও ছাড়িয়ে তাঁর যে মানবতাবোধ—সেই দুই বৈশিষ্ট্যের উপর। রবীন্দ্রনাথ যে নানা দেশে গিয়েছিলেন এবং বিদেশী পণ্ডিতদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন এডিথ টোথ সে কথাও উল্লেখ করেন।

মাতিয়াস মাত্রাই মানব-মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের কাছে কত উচ্চ স্থান পেয়েছে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাত্রাই দেখান যে রবীন্দ্র-নাথের মতে মানুষ পৃথিবীর দাস নয়, তার প্রেমিক।

সংক্ষিপ্তসার

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব নিয়ে আজ আর কেউ খুব গভীর আপত্তি তোলেন না। তবু ও রবীন্দ্রনাথের অপব্যাখ্যাকারগণ যে সব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটিয়ে গেছেন তার ফল এখনো আমাদের সামনে বর্তমান।

ভুল করে বা ইচ্ছে করে যে সব অপব্যাখ্যা করা হয় তার প্রায় সবেরই জন্য দায়ী করা যায় ঐ যুগের সাধারণ মতাদর্শগত প্রবণতাকে। বিশের দশকের দিকে ভাল করে তাকালেই চোখে পড়বে জার্মানী, হাঙ্গেরী এবং অন্যান্য সব ইউরোপীয় দেশে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ইউরোপীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটে ১৯১৮ সালে। তিনটি পুরোন রাজত্বের পতন হলো, রাশিয়ায় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম নিল। হাঙ্গেরী হাপসবুর্গ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করল, যদিও সে তার জনসংখ্যা আর ভূভাগের বেশ একটা বড় অংশ হারাল। হাঙ্গেরীর ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়ল সেখানকার ১৯১৮-১৯১৯ সালের গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির অসাফল্যের ফলে।

ক্যাথলিক লেখক ইসতভান জাবোরস্জ্‌সকি সঠিকভাবে সেই সময়কার "ধর্মবিরোধী গোষ্ঠীর" ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। এই সব গোষ্ঠী এবং অন্যান্য অনেকে ১৯২০ সালের আগে দেশে চিন্তার স্বাধীনতা এবং আরো সব গণতান্ত্রিক সংস্থার এবং পরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য সক্রিয় ছিলেন। এঁরা স্বাভাবিকভাবেই হাঙ্গেরীর চার্চের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত প্রচলিত প্রতিষ্ঠানিক শক্তিসমূহের বিরোধী ছিলেন। এই "ধর্মবিরোধী গোষ্ঠী"র ভিতর

ছিলেন অতি বিচিত্র ধরণের লোকেরা। তাঁদের উদ্ভব সমাজের নিম্নতর শ্রেণীগুলির মধ্যে। হাঙ্গেরীয় সমাজের চেহারা আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায় দেশের মধ্যবিত্তদের জন্য। এঁরা ছিলেন হাঙ্গেরীতে প্রচলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত—দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের ইহুদীরা, যাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতি সবই জার্মানী থেকে পাওয়া। তা-ছাড়া এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে ছিলেন ক্যাথলিকরা, প্রোটেস্টান্টরা, স্বাধীন-চিন্তাবাদীরা, নাস্তিকরা এবং হাঙ্গেরীয় থিয়সফিস্ট, বৌদ্ধ-মতাবলম্বী এবং স্পিরিচুয়ালিস্ট প্রভৃতিদের ক্ষুদ্র দলগুলি।

১৯২০ সালের পরে উপরোক্ত মধ্যবিত্তদের এক বড় অংশ এবং বহু সমাজতন্ত্রবাদী রবীন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট হলেন। এই প্রসঙ্গে একটি দিকে পাঠকদের সাবধান হতে হবে। ইস্ত্‌ভান জাবো-রস্‌জ্‌সকি হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার জনপ্রিয়তা, তাঁর বিশ্ববীক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলেন যেমন ধর্মবিরোধীদের মধ্যে তেমনি সোতার-কথিত যুক্তিহীন দর্শনাশ্রয়ীদের মধ্যে। রবীন্দ্র-নাথের হাঙ্গেরীয় অনুগামীদের ধর্মবিরোধী বলা কিংবা যুক্তিহীনদের দল হিসেবে গণ্য করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবে কি রবীন্দ্রনাথের যে বাণী হাঙ্গেরীয়রা শুনেছিল তা দেশের বুদ্ধিজীবিদের যুক্তিহীনতাকে উদ্দীপিত করেছিল, কিম্বা প্রাটেস্টান্ট, বৌদ্ধমতালম্বী এবং থিয়সফিস্ট-দের সত্যি সত্যি ধর্মবিরোধিতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল? বিরাট এক মানবদল, যাতে যুক্ত হয়েছে নানান মতের মানুষ, সেইরকম রবীন্দ্র অনুগামীদের ওপর কি কোন একটা লেবেল মেরে দেওয়া যায়? নিশ্চয়ই না। ইস্ত্‌ভান জাবোরস্‌জ্‌সকি-র অভিযোগ যদি খাটে তবে সেটা কেবল অতি ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠীর উপরে। সে গোষ্ঠীতে ছিল সমাজ-ছাড়া কিছু লোক, যারা আগে থেকেই যুক্তি-হীনতা এবং ধর্মবিরোধিতার সমর্থক ছিল।

আসল আমাদের উপরোক্ত ধরণের অতি সরলীকৃত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকের এবং

বিংশ শতকের জার্মান আদর্শবাদী দর্শনের সব ধারাকেই আমরা যুক্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। তাছাড়া সেরকম ধারা যদিও বা ছিল, তার কখনোই হাঙ্গেরীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর একক প্রভাব বিস্তার করেনি। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মতত্ত্বের কথা যদি ধরা যায়, তার দৃঢ় ভিত্তি ছিল যুক্তিবাদের মধ্যে। হাঙ্গেরীর সমাজ-তন্ত্রবাদীরা কিম্বা স্বাধীন-চিন্তাবাদীরা মার্কসবাদ করতেন যথেষ্ট মাত্রায়—কখনো মূল গ্রন্থাদিতে, কখনো পরোক্ষভাবে ভাষান্তরে। উদারনৈতিক মনীষীরা এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার এক বড় দল ডিলথ-এর বিশ্ববীক্ষার অনুসারী হয়েছিলেন। থিয়সফিসরা নির্ভর করতেন আন্তর্জাতিক থিয়সফিকাল আন্দোলনের থেকে গৃহীত সব তৈরী ধারণার উপর এবং তাঁরা ততটাই যুক্তিহীন ছিলেন যতটা ছিল ঐ সমগ্র আন্দোলনটি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো ১৯১৮ সালের আগে। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল প্রভূত পরিমাণে, এমন কি ১৯১৮-১৯১৯ সালেও সমাজতন্ত্রবাদীরা রবীন্দ্রনাথের উচ্চ প্রশংসা করতেন তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে ভালবাসতেন।

১৯২০ সালের পরে অন্য ব্যাপার ঘটল। তখন প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ সরকারী মহল থেকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী সমর্থন পেতে শুরু করেছে। কাজেই মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক শক্তি বিরোধী যাঁরা ছিলেন তাঁদের দলকে ক্ষীণ করে দিয়ে প্রোটেস্টাণ্টরা সে-দল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিশপ রাভস্‌জ্‌ নিজে যেহেতু এই প্রোটেস্টাণ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই তিনি প্রতিষ্ঠানিক-শক্তি-বিরোধীদের রবীন্দ্র-অনুরাগ সমর্থন করতে না পেরে রবীন্দ্র-বিশ্ববীক্ষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই সমালোচনার সময় বিশপ রাভাস্‌জ্‌ অনুসরণ করেছিলেন প্রচলিত প্রোটেস্টাণ্ট দর্শন।

তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোভাবে হাঙ্গেরীতে যে-পরিবর্তন দেখা দিল তার উৎস আলোচনা পূর্বের পরিচ্ছেদে চেষ্টা

করেছি। এখন কেবল একটি বিষয়ের কথাই তুলব। হাঙ্গেরীর যে ছোট দলটিকে যুক্তিহীন বলা চলত, তারা সত্যি সত্যিই যুক্তিহীন হয়ে পড়ল যখন তারা রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করল এবং তাদের আগ্রহকে সন্নিবিষ্ট করল মরমীয়াবাদ এবং তৎসংক্রান্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনায়—যেমন, পি, ব্রানটন লিখিত 'আ সার্চ ফর সিক্রেট ইণ্ডিয়া' নামের গ্রন্থে। (১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩-এর মধ্যে বইটির তিনটি সংস্করণ হয়েছিল)।

এই সমস্ত আলোচনাই সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে আরেক কারণে। যে-সমস্ত শব্দ ইংরেজিতে যাকে বলে টার্ম, দর্শন অথবা ধর্মে এক একটি ধারণাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝায়, সেই সব শব্দ বা টার্মের দীর্ঘকালীন ভ্রান্তমত-প্রসূত অপব্যবহার এই সমস্যা তৈরি করে। এর ফলে বিশের দশকে বহু লোক ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েছেন এবং আজও যেমন সাধারণ পাঠক তেমনি বিশেষজ্ঞরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

অবশ্য এটা নতুন কথা নয়। অ্যারণসনের বক্তব্য ধরা যাক। তিনি অনেক দিন আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন—যে পশ্চিমের কোন পাঠকের পক্ষে একজন প্রাচ্যের কবিকে বুঝে ওঠা একেবারেই সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও তা হবে "নেহাৎই দৈবাৎ"। কারণ ঐ পাঠকের নাকি প্রাচ্যের কবিতা বা চিন্তা বোঝার জন্য প্রাচ্যের মানসিকতা দরকার। আবার কারো কারো মতে প্রাচ্যের কবিতা পাঠকের মনে প্রবেশ করতে পারে যদি সেই মন প্রস্তুত হয়ে ওঠে প্রাচ্যবিষয়ক, অর্থাৎ হিন্দু অধ্যাত্মবাদ পড়াশুনোর দ্বারা। এফ, ষ্টাল লিখেছেন: "সত্যি কথা বলতে কি, পশ্চিমের অনেকেই প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন তার তথাকথিত যুক্তি-হীনতার জন্য। বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং ধর্ম-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গেও সুদীর্ঘকাল জড়িত থেকে যাঁরা অতৃপ্ত, তাঁরা খোঁজেন যুক্তিহীনতাকে বিদেশের রঙিন পাত্রে। আর সেই প্রয়োজন তাঁদের পক্ষে

ভালোভাবেই মেটায় প্রাচ্যের নানান ধর্ম এবং পুজাপদ্ধতি। প্রাচ্যের এসব যে ঠিক তা নয় তাদের দিকে যদি আমরা ভালো করে মনোযোগ দিই তাহলেই সেটা বোঝা যায়।"

তাহলে আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে তা হলো হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের এক অলীক মূর্তি গড়ে উঠেছিল তাঁর অধ্যাত্মবাদকে ঘিরে এবং অক্ষম অনুবাদের দ্বারা, যা তাঁর কাব্য প্রতিভাকে মোটেও ভাল করে প্রকাশ করতে পারেনি। হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্র-অনুরাগীরা সেই-জন্যই আস্তে আস্তে বিভক্ত হয়ে পড়লেন আর বিভিন্ন চার্চগোষ্ঠীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এই "বিপদের" ভয়ে যে প্রচলিত ধর্মে আস্থা হারিয়ে লোকেরা এই সব চার্চের আশ্রয় ত্যাগ করবে।

বিশের দশকের উপর আর একটু সময় দেওয়া যাক। রবীন্দ্র-নাথের অধ্যাত্মবাদ প্রকৃতপক্ষে যুক্তিহীন ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে অধ্যাত্ম অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা প্রকৃত বা কৃত্রিম হতে পারে কিন্তু "তাকে যুক্তিসঙ্গত বা যুক্তিহীন বলার কোন মানেই হয় না।" অধ্যাত্মবাদকে কী ভাবে দেখতে হয় তার একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন ইভলিন আণ্ডারহিল রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদগ্রন্থ 'পোয়েমজ্ অব কবীর'-এর মুখবন্ধে। তিনি লিখেছেন: অধ্যাত্মবাদী কবিতাকে একদিক থেকে বর্ণনা করা যায় বাস্তব সম্বন্ধে অন্তর-দর্শনের এক নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে, অন্য দিক থেকে তাকে দেখা চলতে পারে এক ধরণের ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে।...এ হচ্ছে প্রেমের কবিতা। কিন্তু এমন প্রেমের কবিতা যার উদ্দেশ্য প্রায়ই হয়ে থাকে ধর্ম প্রচারমূলক।"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রেষ্ঠতম অর্থে কবি। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন মনীষীও। তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে কারণ "তিনি এক অধ্যাত্মবাদকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন, যে অধ্যাত্মবাদ অদ্বৈতবাদ বা ভক্তিবাদ কোনটিই নয়। অথচ উভয়েরই এক সৃজন সংমিশ্রণ।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

এবং

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো স উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

এই দুই শ্লোককে যদি মূল বলে ধরা যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাকে বলা যায় তাদের ব্যাখ্যা। এদের দিয়েই তাঁর কবিতার উপাদান গড়া…।" (জেহ্‌নার)

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিম্বা সামাজিক বা দার্শনিক বিষয়ের উপর তাঁর প্রবন্ধাদিতে একজনের মন কী ভাবে সাড়া দেবে তা নিয়ন্ত্রিত হয় তার সামাজিক অবস্থা এবং মনোভাবের দ্বারা। এই সামাজিক অবস্থা যখন বদলায় তখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও পাল্‌টায়। কাজে কাজেই যখন ১৯৩৫ সালের পরে হাঙ্গেরীয় সমাজ গণতান্ত্রিক পথ বেছে নিল এবং পরে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করল কয়েক ধরণের চিন্তাধারা প্রায় পুরোপুরিই অদৃশ্য তখন হলো। আজ হাঙ্গেরীতে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ইতিহাস ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে রচনার নিয়মিত পাঠকের দল অতি বিস্তৃত। ফলে রবীন্দ্রনাথের লেখা এখন হাঙ্গেরীতে এক হাজার-দুহাজার কপির বদলে পাওয়া যায় দশ হাজার কপির প্রকাশিত সংস্করণে। রবীন্দ্র-রচনা পাঠকদের মধ্যে আছেন বুদ্ধিজীবী শ্রমজীবী এবং নানান বৃত্তির মানুষ। মনে রাখতে হবে যে প্রাক্‌বিশ্বযুদ্ধ পাঠকদের তুলনায় এইসব পাঠকদের মানসিকতা একদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমানে তাঁদের মনে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব নিয়ে কোন আশঙ্কা নেই, তার বদলে আছে গণতান্ত্রিক পথে দেশের সামাজিক অগ্রগতিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস। এঁরা মার্কসবাদী হতে পারেন আবার ধর্মবিশ্বাসীও হতে পারেন। যাঁরা ধর্মে বিশ্বাস রাখেন তাঁরা কিন্তু আজ তাঁদের বিশ্বাস আর রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের মধ্যে কোন বিরোধিতা দেখতে

পান না। হাঙ্গেরীর ক্যাথলিক চার্চের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া যদিও গোঁড়া মতাদর্শগত পার্থক্য এখনো ক্যাথলিক এবং ক্যাথলিক নয় এমন সব পাঠকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তথাপি সে-পার্থক্য কারুর প্রাত্যহিক ধর্মচর্চাকে প্রভাবিত করে না। তাছাড়া বর্তমানে মানবতাবাদের প্রসার, বিশ্বশান্তিকে সুদৃঢ় করা এবং মানব প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা প্রভৃতির ব্যাপারে ক্যাথলিক চার্চ অন্যান্য সকলের সহযোগিতা চাইছে।

অন্যদিকে, মার্কসবাদের ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা খুব একটা বড় বাধার সৃষ্টি করে না। রবীন্দ্রনাথকে এখন উনবিংশ শতকের এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধের একজন অসাধারণ কবি এবং প্রগতিশীল মনীষী হিসেবে গণ্য করতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের রাজনীতির অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ তিনি সুস্পষ্টভাবেই ধরতে পেরেছিলেন।

সামন্ততন্ত্রবাদের কিম্বা ভারতের সব প্রশ্নই তাঁর চোখে পড়েছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোন দিকে জগতের ইতিহাসের শক্তিসমূহ ধাবমান। সেই জন্যেই তিনি ফ্যাসিবাদকে ধিক্কার দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন জানান।

অবশ্য এই সঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর জন্ম উনবিংশ শতকে এবং তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁর সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষা এই দু'টি সত্যের দ্বারা চিহ্নিত। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা যখন রূপ নিল, তখন ইউরোপীয় দর্শন নানা ভাগে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে, অধিবাদ, সমাজবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব এবং নীতিবাদ ইত্যাদিকে এক বিধির অন্তর্গত করে দেখার চলন আর নেই। রবীন্দ্রনাথ যে সামগ্রিকভাবে একটি বিধির ওপর ভিত্তি করে সব দর্শন-সমাজগত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েছিলেন, সেটা বোধহয় তাঁর ভক্তদের চাপে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধের তৎকালীন অবস্থার কারণে। সেইজন্যেই হয়তো তাঁর প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে সফল হয় নি।

পশ্চিমের আধুনিক কালের সমাজগত এবং মতাদর্শগত সঙ্কট দূর করার যে পন্থা তিনি নির্দেশ করেছিলেন সে সম্বন্ধে হাঙ্গেরীয় আলোচনাদিতে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই সমালোচনা হয়েছিল। সে সমালোচনাকে বা আপত্তিকে আজ ও আমাদের সমর্থন করতে হবে। কেননা, মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে মতাদর্শগত অগ্রগতিকে সামাজিক-অর্থনীতিক বিকাশের থেকে আলাদা করে দেখা যায় না; এই দুই-এর মধ্যে যে জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয় উক্ত যে কোন বিষয়ক প্রশ্নে। রবীন্দ্রনাথ যদিও ইউরোপের বিকাশের বিষয় মোটামুটি জানতেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি ঐ বিকাশের ভিত্তি কী। তাছাড়া ঐ বিকাশ যে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পর্য্যায়ে রয়েছে সেটাও তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। আসলে কোন একটি ধারণাই সেই দেশের সামাজিক গঠন বিচার না করে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না।

সে যাই হোক, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসাদে আজ হাঙ্গেরীয় পাঠক উৎকৃষ্টতর অনুবাদের মাধ্যমে এবং তাঁর ওপরে লিখিত নানা ছোট ছোট গবেষণার সাহায্যে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন বিতর্ক এবং ভ্রান্ত ধারণার সমুদ্রের মধ্যে থেকে একটি নতুন এবং শুচিশুভ্র রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি যেন আস্তে আস্তে উঠে আসছে।

রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভা তাঁর সময়কার দেজ্‌সো কোসজ্‌তোলান্যী, মিহালি বাবিৎস প্রমুখ কবিরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের কবিরাও তাঁর কাব্য অনুবাদের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এই সব নতুন তর্জমায় তাঁর কাব্যের মোহিনী শক্তি বহুল পরিমানে প্রকাশিত। কিন্তু এসব তর্জমার মান আরো উন্নত করতে হবে মূল বাঙলা কবিতার উপর নির্ভর করে। লোকসাহিত্য এবং লোকসঙ্গীত থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। আবার তার পরিবর্তে তিনি লোকজীবনকে দিয়েছেনও বহু

উপহার। আধুনিক ভারতে এবং সমগ্র বিশ্বে গীতি কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। তাঁর কবিতা বাস্তব এবং সামাজিক প্রশ্নকে এড়িয়ে যায় বলে যে অভিযোগ শোনা যায় তা একেবারেই অসার। কারণ তাঁর কবিতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব দীপ্তিতে এবং মানবতাবাদের গভীরতায় পূর্ণ।

হাঙ্গেরীয় জনসমাজে নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তেমন পরিজ্ঞাত নন। রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনের নানা বাধা থাকার জন্য সেগুলি অভিনীত হতে পারেনি অদূর ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না।

তাঁর ছোটগল্পের নতুন সংস্করণগুলি কিন্তু খুবই সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির, বিশেষত গোরা-র আবার নতুন করে অনুবাদের এবং প্রকাশের প্রয়োজন আছে। তাঁর ছোটগল্পের সামাজিক পটভূমি সুবিস্তৃত। তাতে ছবি রয়েছে মধ্যবিত্তদের, চাষীদের ও সাধারণ মানুষের। তাই তারা আধুনিক পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। আবার যাঁরা ক্লাসিকাল উপন্যাস পছন্দ করেন, তাঁদের রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাল লাগবেই।

রবীন্দ্র রচনাবলী তার নতুনতম সংস্করণের মধ্যে দিয়ে হাঙ্গেরীতে খুবই জীবন্ত হয়ে আছে। তাঁর লেখা আর তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে আমরা মাথা নত না করে পারি না। কারণ তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি এবং মহান মনীষী যাঁর নাম ভারতের নবজাগরণ এবং মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত।

———

LIBRARY AND INFORMATION CENTRE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
MTA KÖNYVTÁR
ÉS
INFORMÁCIÓS
KÖZPONT